১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
Fortnightly
The Ahmadi

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ১৬তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ফাল্গুন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ২৭ রবি. সানি, ১৪৩৫ হিজরি | ২৮ তবলিগ, ১৩৯৩ হি. শা. | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ঈসাব্দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৯০তম জলসা সালানা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সফলতার সাথে সমাপ্ত

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

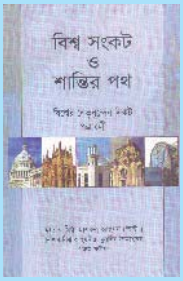

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**। **বইটির মূল্য ৬০/- (ষাট টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon

Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে আর জাতিসমূহ তাঁর কাছ থেকে আশিস লাভ করবে

পৃথিবীতে এমন মহা পুরুষগণ এসেছেন, যাদের আগমণ বার্তা আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের জন্মের পূর্বেই জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন। এমন-ই এক মহান সত্তা ছিলেন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৮৮৬ সালের ২২ জানুয়ারি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে হুশিয়ারপুরে যান। ইসলামের চরম দুর্দিন দেখে অত্যন্ত ব্যাথাতুর হৃদয়ে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতার সমর্থনে বিশেষ নিদর্শন কামনা করে তিনি সেখানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নির্জনে নিভৃতে আল্লাহ্ তাআলার কাছে বিশেষ দোয়া করেন। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারি একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এতে বহু ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে এক প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্মলাভের সুসংবাদও ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, ".....তুমি সুস-ংবাদ গ্রহণ কর, তিনি আল্লাহর নূর ..... সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে..... জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে..... সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়বে এবং বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে। আর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে" (ইশতেহার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬)। খোদা তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী এ প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্ম হলে তার নাম রাখা হলো মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ।

মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯১৪ সালে তিনি আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হোন। দীর্ঘ ৫২ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে এক দূর্বল, অসহায়, অর্থ-সম্পদহীন জামা'তকে মজবুত এক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন। জামা'তকে উপমহাদেশের গন্ডি থেকে বের করে বহির্বিশ্বের কোণায় কোণায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রায় অর্ধশত দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁর আশিসপূর্ণ কল্যাণধারা 'তাহরীকে জাদীদ'-এর সুফল লাভে বর্তমানে দুই শতাধিক দেশে এই জামা'ত সাংগঠনিক কাঠামো লাভ করেছে। আর সেই অগ্রযাত্রা সদা প্রবহমান রয়েছে।

তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি হাজারো বক্তৃতা, দু'শতাধিক পুস্তক, কুরআনের অতুলনীয় তফসীর-এর মাধ্যমে রেখে গেছেন জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্র। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাও ছিল অতুলনীয়। জগৎ দেখেছে আর ভবিষ্যতেও দেখবে কিভাবে তিনি মুসলেহ্ মাওউদ হয়েছেন, আর কিভাবে সেই সব প্রতিশ্রুতি তাঁর মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একাধারে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর' কমিটি গঠন করেছেন, দাবি তুলেছেন ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে। ফিলিস্তিন ও মুসলিম বিশ্বকে সতর্ক করেছেন ইহুদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে।

হযরত মির্যা মাহমুদ স্বয়ং-ই যে 'মুসলেহ্ মাওউদ' বা সেই প্রতিশ্রুত পুত্র তা তিনি নিজেই ১৯৪০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে ঘোষণা দেন। এ জন্য আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতি বছর এই দিনটিতে তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই মহান ব্যক্তির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। ১৯৫২সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছিল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো কত নাম না জানা বাংলার বীর সন্তানেরা। টগবগে রক্ত ঝরানো বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের সেই আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি আমাদের প্রিয় ভাষা– মাতৃভাষা বাংলাকে 'রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে। পাকিস্তানের অন্ধ, স্বৈর-শাসকগোষ্ঠীর বাংলা বিদ্বেষ থেকে বাঙ্গালীরা প্রতিবাদী, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। মাতৃভাষার জন্য মর্যাদা ও মহিমা সমুন্নত ও অম্লান করে রাখতে এই আত্মদান সারা পৃথিবীতে প্রথম। আজ সারা পৃথিবীতে তাদের এ ত্যাগ স্বীকৃত হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর মর্যাদা পেয়েছে। এজন্য আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়। আমরা এই দিনে সেইসব বীর সন্তানদের পরম ভালবাসায় স্মরণ করার পাশাপাশি নিজেরা যদি অঙ্গীকারাবদ্ধ হই মাতৃ ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিজেদেরকে সদা প্রস্তুত রাখার, তবেই এই একুশে উদযাপন স্বার্থক হবে।

সূচিপত্র

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

২০০৩ সালে যুক্তরাজ্য জলসায় লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ভাষণ। ৬

বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক- "রাব্বুল আলামীন" ১৭
মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

কলমের জিহাদ ২১
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

অতীত দিনের কিছু কথা ২৬
সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী (মরহুম)

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২৯

ভাষা আল্লাহ্‌র বিশেষ দান ৩০
মাহমুদ আহমদ সুমন

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার ৩২
সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

নবীনদের পাতা- ৩৪
নাসের আহমদ, রেজোয়ানা করিম (রোদেলা), সরকার মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামান

পাঠক কলাম- ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান ৩৭
লাকী আহমদ, আনোয়ারা বেগম, আহমদ উজ্জ্বল, ফারহানা মাহমুদ তন্বী, নিশাত জাহান রজনী

সংবাদ ৪১

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৪৭

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

দৃষ্টি আকর্ষণ

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামা'তের যে সকল সদস্য 'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকার গ্রাহক কিন্তু তাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদের বকেয়া চাঁদা সংগ্রহ করে কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এছাড়া যারা পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক নন তারা মাত্র ২৫০/- টাকায় পুরো এক বছরের গ্রাহক হতে পারেন আর বহির্দেশে গ্রাহকদের জন্য ১০০ ডলার।

মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
যোগাযোগ : ০১৯১৮-৩০০১৫৬, ০১৬৮৬২৬৪৫৯৬

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩। এভাবেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে বিদ্রূপ করার এ[১৪৮৩] প্রবণতা সঞ্চার করে দেই।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। তারা এ রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না, অথচ পূর্ববর্তীদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র বিধান ইতিহাস হয়ে আছে।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। আর আমরা যদি তাদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দিতাম এবং তারা (রাসূলের সত্যতার নিদর্শন নিজ চোখে দেখে নেয়ার জন্য) এতে আরোহণ করতে থাকতো[১৪৮৪]

لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। তবুও তারা অবশ্যই বলতো, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করে দেয়া হয়েছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত জাতি[১৪৮৫]।

১৪৮৩। এই সর্বনামটি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'কাফিরদের দ্বারা পবিত্র নবীগণকে বিদ্রূপ করার বদ অভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

১৪৮৪। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, যদি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অনুকম্পার ও ক্ষমার দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিতেন এবং শাস্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করে দিতেন তাহলে অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ তা'লার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে পার্থিব আরাম-আয়েশের মধ্যে আরও বেশি মগ্ন হতো।

১৪৮৫। অবিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে এতই অজ্ঞ যে, যদি সব অভিজ্ঞতার দু'একটি অভিজ্ঞতা তাদের থাকতো, যার মধ্য দিয়ে নবী করীম (সা.) অতিক্রম করেছিলেন এবং রূহানী উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন এবং কিছু দৃশ্য তারা অবলোকন করতো, তবুও তারা বিশ্বাস করতো না, বরং বলে উঠতো, তারা ভেল্কি বা যাদুর শিকার হয়েছে।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্‌র যিক্‌র

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে জাতি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে, রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে এবং শান্তি তাদের ওপর নাযেল হয় এবং আল্লাহ্‌র নিকট যারা থাকে, তাদের নিকট তিনি তাদেরকে স্মরণ করেন। (মুসলিম)

হযরত আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন–যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে এবং যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে না, তাদের তুলনা জীবিত ও মৃতদের ন্যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন– মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন– যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে, আমি তার নিকটে থাকি; এবং সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে তার মনে আমাকে স্মরণ করে, আমি আমার মনে তাকে স্মরণ করি, এবং যখন সে কোন লোকের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তাদের চেয়েও উত্তম সঙ্গীদের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে অসদ্ব্যবহার করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে শত্রুতা করি। বান্দার ওপর আমি যে কাজ ফরয করেছি, তা ব্যতীত অন্য কোন অধিকতর উত্তম কার্যের দ্বারা সে আমার নৈকট্য চাইতে পারে না। যখন আমি তাকে ভালবাসি, আমি তার কর্ণ হই, যদ্বারা সে শুনে, আমি তার চক্ষু হই, যদ্বারা সে দেখে, তার হাত হই, যদ্বারা সে ধরে, এবং তার পা হই, যদ্বারা সে চলে। সে আমার নিকট চাইলে অবশ্যই আমি তাকে দেই। সে আমার নিকটে আশ্রয় চাইলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই। যে মু'মিন মৃত্যুর ইচ্ছা করে না, তার প্রাণ হরণ করতে আমার যে দ্বিধা হয়, তার চেয়ে অধিকতর দ্বিধা আমার অন্য কোন কার্যে হয় না। আমি তার অনিচ্ছাকে অপসন্দ করি, কিন্তু তা (মৃত্যু) হতে অব্যাহতি নেই। (বুখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রা.) হতে বর্ণিত, একজন গ্রাম্য-ব্যক্তি হুযূর (সা.) এর নিকট এসে বলল, কোন্‌ লোক উত্তম? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার বয়স দীর্ঘ এবং কাজ সৎ। সে বলল, হে রসূল! কোন কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র যিক্‌র দ্বারা রসনাসিক্ত অবস্থায় তোমার দুনিয়া হতে বিদায়। (তিরমিযী)

যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে এবং যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে না, তাদের তুলনা জীবিত ও মৃতদের ন্যায়।

অমৃতবাণী

মুহাদ্দাসীয়্যত নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণভাবে খোদার দান

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার কসম! আমি খোদা ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, আর আমি বিশ্বাস রাখি, তিনি খাতামান নবীঈন। অবশ্য আমি একথা বলেছি, সকল তাহ্‌দিসেই (বান্দার সাথে খোদার কথোপকোথন) নবুওয়তের অংশ পাওয়া যায়, কিন্তু তা অন্তর্নিহিতভাবে থাকে, কার্যতঃ নয়। অতএব, মুহাদ্দাস অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও স্বরূপের দিক থেকে নবী হয়ে থাকেন। যদি নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ না হতো, তাহলে কার্যতঃ তিনি নবীই হতেন। আর এ বিষয়ে আমাদের এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে, মোহাদ্দাসের পরম উৎকর্ষের নামই নবী।

কেননা, তিনি তাঁর সকল গুণাবলীর সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন প্রতিফলন হয়ে থাকেন .....একইভাবে একথা বলাও বৈধ হবে, মুহাদ্দাস নিজ সুপ্ত-গুণাবলীর নিরিখে নবী, অর্থাৎ-মুহাদ্দাস অন্তর্নিহিত যোগ্যতার নিরিখে নবী। নবুওয়তের যাবতীয় উৎকর্ষ পুরোপুরিই মুহাদ্দাসের মাঝে প্রচ্ছন্ন ও সুপ্ত থাকে। নবুওয়তের প্রতিবন্ধকতাই কার্যতঃ এর প্রকাশ ও আবির্ভাবের পথ রুদ্ধ রেখেছে। মহানবী (সা.) 'আমার পরে নবী থাকলে ওমর নবী হতো' উক্তিতে এদিকেই ইশারা করেছেন। ওমর (রা.)-এর মুহাদ্দাস হবার ভিত্তিতেই তিনি একথা বলেছেন।

অতএব তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, মুহাদ্দাসের মাঝে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য ও বীজ সুপ্ত থাকে, কিন্তু খোদা তা'লা সেই অন্তর্নিহিত যোগ্যতাকে কার্যকর রূপ দিতে চাননি। আর ইবনে আব্বাসের ***'ওয়া মা আরসালনা মির রসূলীন ওয়া লা নবীইন ওয়া লা মুহাদ্দাসিন'*** কেরাআতটিও এ দিকেই ইঙ্গিত করে। দেখ! কীভাবে নবী, রাসূল ও মুহাদ্দাসদের, এই কেরাআতে একই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে! আর খোদা তা'লা বলেন, তাঁরা সকলেই নিষ্কলুষ ও রাসূলদের অন্তর্গত।

নিঃসন্দেহে, মুহাদ্দাসীয়্যত সম্পূর্ণভাবে খোদার দান। এটি আদৌ চেষ্টা করে অর্জন করা যায় না। যেভাবে নবুওয়তের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তিনি মুহাদ্দাসদের সাথে সেভাবেই কথা বলেন, যেভাবে নবীদের সাথে কথা বলেন। মুহাদ্দাসদের সেভাবে প্রেরণ করা হয় যেভাবে রাসূলদের প্রেরণ করে থাকেন। মুহাদ্দাস সেই একই ঝর্ণা থেকে আধ্যাত্মিক সুধা পান করেন, যেখান থেকে নবী পান করেন। যদি দ্বার রুদ্ধ না হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি নবী হতেন। রাসূলুল্লাহ্ যে হযরত ওমর (রা.)-কে মুহাদ্দাস আখ্যা দিয়েছেন, তার রহস্য এটিই, যার সাথে তাঁর এই উক্তিও রয়েছে, 'আমার পর নবী হবার থাকলে ওমর নবী হতো'। এটি কেবল এদিকে ইঙ্গিত করে, একজন মুহাদ্দাস নিজের মাঝে নবুওয়তের যাবতীয় উৎকর্ষ ধারণ করে থাকেন।

অতএব, তফাৎ কেবল প্রকাশিত-গুণ এবং অন্তর্নিহিত গুণের এবং অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত যোগ্যতা এবং সেই যোগ্যতার বাহ্যিক প্রতিফলনের। কাজেই নবুওয়তের উপমা হলো, একটি বাহ্যিক ফলবতী গাছের মত, যা অজস্র ফল বহন করে, আর তাহ্‌দীস এক বীজ সদৃশ, যাতে অন্তর্নিহিত সেসব কিছু থাকে, যা কার্যতঃ ও বাহ্যতঃ বৃক্ষে থেকে থাকে। যারা ধর্মের নিগুঢ় তত্ত্বের সন্ধানে থাকে, তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। 'আমার উম্মতের আলেমরা বনী ঈস্রাইলী নবীদের ন্যায়'-এ হাদীসে মহানবী (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এখানে ওলামা বলতে সেসব মুহাদ্দাসদের বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে নিজ প্রভুর সন্নিধান থেকে জ্ঞান দেয়া হয়ে থাকে এবং তারা সম্বোধিত হন।

কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য নবুওয়ত ও তাহ্‌দীসের মাঝে পার্থক্য করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু অন্তর্নিহিত সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রকাশিত কার্যে রূপায়িত ব্যক্তির। যেমনটি এখনই আমি বৃক্ষ ও বীজের দৃষ্টান্তের আলোকে স্পষ্ট করেছি। অতএব, আমার এ কথা গ্রহন করো, আর খোদা ছাড়া কাউকে ভয় করো না। এছাড়া খোদার কাছে দোয়া করো, যেন তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদের শ্রেণীভূক্ত হতে পারো।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত 'হামামাতুল বুশরা' বাংলা সংস্করণ পৃ: ১৪৬-৪৭ থেকে উদ্ধৃত]

২০০৩ সালে যুক্তরাজ্য জলসায় লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ভাষণ।

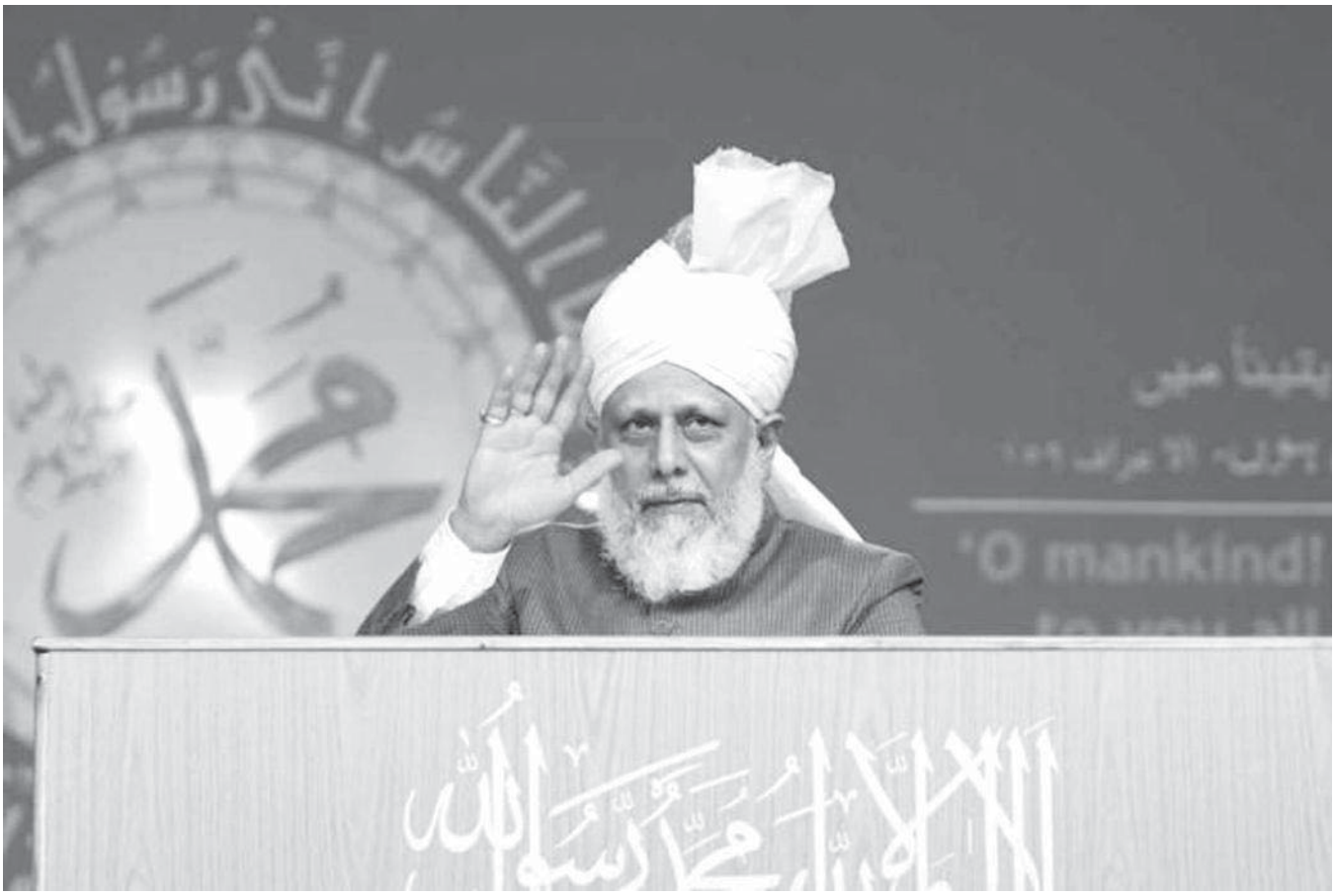

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর সূরা আহ্কাফ এর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

(সূরা আল্ আহ্কাফ: ১৬)

এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, সে পুরুষ হোক বা নারী; বিয়ে-শাদির পর এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাদের ঘরে সন্তান-সন্ততি হবে আর স্বাস্থ্যবান সন্তান হবে, যারা তাদের নাম উজ্জ্বল করবে, বড় হয়ে তাদের কাজে আসবে। সম্পদশালী হলে চায়, সন্তান বড় হয়ে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল ধরবে, সম্পত্তি দেখাশোনা করবে এবং ব্যবসার প্রসার ঘটাবে। আর দরিদ্র হলে ছেলের বাসনা রাখে, দরিদ্ররা বিশেষ করে ছেলে সন্তানের আশা করে, যেন বড় হয়ে তাদের অবলম্বন হয় বা সাহায্যকারী হতে পারে। কিন্তু, এমনও একটি শ্রেণী আছে, যারা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয় আর এ আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করে, আমাদের ধর্ম সর্বদা পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য পাক, আর এ উদ্দেশ্যে চেষ্টাও করে; এদের মাঝে ধনী-দরিদ্র উভয়ই রয়েছে। বস্তুতঃ এরাই সফল দল, যারা স্বয়ং পুণ্য-পথ অবলম্বনের চেষ্টা করেছে আর সন্তানদের তরবীয়ত বা সুশিক্ষার প্রতিও দৃষ্টি রেখেছে এবং রাখে। তারা সে পথ বেছে নিয়েছে যা খোদার সন্তুষ্টির পথ আর দোয়ার মাধ্যমে তাঁর সাহায্য যাচনা করে সন্তানদের সুশিক্ষিত

“আমি বিশেষভাবে আহমদী মায়েদের এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনারা নিজেদের ছোট্ট শিশুদের মাঝে খোদার ইবাদতের প্রেরণা সৃষ্টি করুন আর এজন্য সদা চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। তাদের সামনে কখনো এমন কথাবার্তা বলবেন না যার ফলে কোনো বদভ্যাস সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে। অজ্ঞতার কারণে যদি সন্তান ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে বারণ করা উচিত। আর সদা এই চেষ্টাই করুন যেন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা তাদের হৃদয়ে গেঁথে যায়।”

করে।

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তা এ ধরনের লোকদের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে। এর অনুবাদ হল, **‘সে বলে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সামর্থ আমাকে দাও এবং আমাকে এরূপ সৎকাজ করারও সামর্থ দাও যা তোমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। আর তুমি আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মশীল কর। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে বিনত হই। আর নিঃসন্দেহে আমি আত্মসমর্পণ-কারীদের অন্তর্ভুক্ত।’**

যেসব পরিবারের মায়েরা পুণ্যবতী, নিয়মিত নামায পড়েন, জামা'তের প্রতি অনুগত, সকল সভা ও ইজতেমায় নিয়মিত যোগদানকারী, নিজেদের কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে হলেও সকল তরবীয়তি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী, জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল, আর সবচেয়ে বড় কথা নিজেদের সন্তানদের জন্য দোয়াকারী, এমন পরিবারের সন্তানরা ধর্মের প্রতি আকর্ষণ রাখে আর পিতামাতারও অনুগত বা বাধ্য হয়। কাজেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, স্বয়ং পিতামাতাকে আদর্শবান হওয়া। তরবীয়ত বা সুশিক্ষার ধারা কীভাবে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বা অব্যাহত রাখা যায়, তা কিছুটা বিস্তারিতভাবে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করবো। কিন্তু সকল কাজের পূর্বে আমাদের এই যে দোয়া শেখানো হয়েছে, **‘(হে খোদা) তুমি আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণ কর। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি বিনত হই। আর নিঃসন্দেহে আমি আত্মসমর্পণ-কারীদের অন্তর্ভুক্ত।’** এটি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন।

কি উদ্দেশ্যে সন্তান লাভের আকাঙ্খা হওয়া উচিত

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যাতে স্পষ্ট হয়, কত মর্মবেদনার সঙ্গে তিনি সন্তানদের তরবীয়ত বা সুশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। এ যুগে জগদ্বাসীর চোখ রাঙ্গানীকে উপেক্ষা করে আমরা যেহেতু যুগ ইমামকে মেনেছি, তাই আমাদের জন্য তাঁর শিক্ষামালা মেনে চলা আর নিজ সন্তান-সন্ততির তরবীয়ত বা সুশিক্ষার জন্য সেই বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করা বাঞ্ছনীয় ।

তিনি (আ.) বলেন, **‘মানুষের ভেবে দেখা উচিত, কি কারণে সে সন্তানের বাসনা পোষণ করে? একে তেষ্টা বা ক্ষুধার মত শুধুমাত্র প্রবৃত্তির তাড়না পর্যন্তই সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। একটি বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে তার সংশোধনের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। খোদা তা'লা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য।** যেমন, তিনি বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝٥٧

{অর্থাৎ, আমি জিন্ ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)} কিন্তু, মানুষ স্বয়ং যদি মু'মিন ও বান্দা (দাস) না হয়, আর নিজ জীবনের মূল লক্ষ্য অর্জন না করে, যথাযথভাবে ইবাদতের দায়িত্ব পালন না করে, ক্রমাগতভাবে পাপ করতে থাকে আর পাপাচারিতায় জীবন কাটিয়ে দেয়, এমন মানুষের সন্তান লাভের আকাঙ্খার পরিণাম কি-ই বা হবে, সে কেবল পাপ করার জন্য নিজের একজন প্রতিনিধি রেখে যাবে বৈকি? পাপাচারিতায় সে নিজে কী আর বাকী রেখেছে যে, সন্তানের আশা করে?

সন্তান হবে ধার্মীক, খোদাভীরু এবং খোদার অনুগত এবং তাঁর ধর্মের সেবক; যতক্ষণ সন্তানের আকাঙ্খা কেবল এ উদ্দেশ্যে না হয়, এটি (সন্তানের বাসনা) একেবারেই অর্থহীন বরং এক প্রকার পাপ ও গুনাহ্। এবং সৎ উত্তরাধিকারীর পরিবর্তে এর নাম পাপের উত্তরাধিকার রাখা যুক্তিযুক্ত হবে।

পুণ্যবান ও খোদাভীরু সন্তানের আকাঙ্ক্ষার পূর্বে আত্ম-সংশোধন আবশ্যক

কেউ যদি বলে, আমি ভাল, খোদাভীরু ও ধর্মসেবক সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি; কিন্তু যদি সে নিজের আচরণগত সংশোধন না করে, তাহলে

তার এই দাবীও বুলিসর্বস্ব হবে। দাবীর ক্ষেত্রে সে মিথ্যেবাদী যে নিজে পাপাচারের মাঝে জীবন কাটায় আর মুখে বলে, আমি সৎ ও খোদাভীরু সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। সৎ ও খোদাভীরু সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পোষণের পূর্বে আত্ম-সংশোধন এবং মুত্তাকীর মত জীবন যাপন করা আবশ্যক, তবেই তার আকাঙ্ক্ষা ফলপ্রসূ হবে আর সত্যিকার অর্থেই এমন সন্তান পবিত্র উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত হতে পারে। কিন্তু এই বাসনা যদি কেবল এ উদ্দেশ্যে পোষণ করা হয়, আমাদের নাম বা বংশের ধারা অব্যাহত থাকবে বা আমাদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে অথবা সে নামীদামী ও খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ হবে; তাহলে এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা আমার দৃষ্টিতে শির্‌ক।

কাজেই একথা বলার উদ্দেশ্য হলো, সন্তান লাভের বাসনা হওয়া উচিত শুধু পুণ্য ও সাধুতার উদ্দেশ্যে, পাপ অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিনিধি রেখে যাবার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়। খোদা তা'লা ভালো জানেন, সন্তানের কোনো আকাঙ্খা আমার ছিল না অথচ পনের-ষোল বছর বয়সেই খোদা তা'লা সন্তান দান করেছিলেন। সুলতান আহমদ ও ফযল আহমদ এই বয়সেই জন্ম নিয়েছিল। তারা জাগতিক খ্যাতি লাভ করুক বা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হোক – এমন কোনো আকাঙ্ক্ষাও আমার মনে জাগে নি। মোটকথা, যে সন্তান পাপাচার ও দূরাচারের মাঝে জীবন কাটিয়ে দেয় এমন সন্তান হওয়ার চেয়ে সাদী'র এই বচনই (ফার্সী: আয পেদর মুরদাহ্ বা নাখালাফ) যুক্তিযুক্ত মনে হয়, 'অথর্ব সন্তানের চেয়ে নিঃসন্তান থাকাই উত্তম।

এছাড়া আরেকটি কথা হচ্ছে, মানুষ সন্তানের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে ঠিকই আর সন্তান লাভও হয় কিন্তু সে সন্তানের উত্তম তরবীয়ত ও তাকে উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করা এবং খোদার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত করার জন্যও চেষ্টা-সাধনা করে– এমনটি কখনো চোখে পড়েনি। তাদের জন্য কখনো দোয়াও করে না এবং তরবীয়ত বা সুশিক্ষা প্রদানের দিকগুলোও দৃষ্টিতে রাখে না।' (আল্ হাকাম, ৫ম খন্ড, নম্বর-৩৫, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০১)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, 'পুণ্যবান এবং প্রত্যাদৃষ্টদেরও সন্তান-সন্ততি হয়ে থাকে। দেখুন! হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এত সন্তান-সন্ততি হয়েছে যে, কেউ গণনা করে শেষ করতে পারবে না কিন্তু তাঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল– একথা কেউ বলতে পারবে না। বরং সর্বাবস্থায় তিনি খোদার প্রতিই সমর্পিত ছিলেন। এটিই প্রকৃত ইসলাম। ইব্রাহীম (আ.)-কেও বলা হয়েছে, 'আসলেম' অর্থাৎ, আত্মসমর্পণ কর। এমন বৈশিষ্ট্য লাভ হলে সে শয়তান ও প্রবৃত্তির তাড়না হতে মুক্তি লাভ করে, এমনকি সে খোদার পথে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যদি প্রাণ বিসর্জনে কুণ্ঠা বোধ করে তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখুন, সে সত্যিকার মুসলমান নয়। খোদা তা'লা নিঃশর্ত আনুগত্য দেখতে চান আর দাসত্বের পরম দৃষ্টান্ত দেখতে চান, এমনকি শেষ আমানত অর্থাৎ প্রাণও দিয়ে হলেও। যদি সে কার্পণ্য করে তাহলে কীভাবে সত্যিকার মু'মিন ও মুসলমান সাব্যস্ত হতে পারে?' (মলফুযাত তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬০১)

'সন্তান-সন্ততির তরবীয়ত সম্পর্কে চিন্তা করুন'

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **'পুনরায় আরেকটি কথা, মানুষ সন্তান-সন্ততির অনেক আশা করে আর সন্তান হয়েও থাকে কিন্তু সে সন্তানের উত্তম তরবীয়ত ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী বানানো এবং খোদার প্রতি বিশ্বস্ত ও সমর্পিত বানানোর জন্যও চেষ্টা-সাধনা করে– এমনটি কখনো দেখা যায় না। আর তাদের জন্য কখনো দোয়াও করে না এবং তরবীয়তের বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখে না।'**

হুযূর (আ.) বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত অবস্থা হলো, এমন কোনো নামায নেই যাতে আমি আমার সকল বন্ধু, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর জন্য দোয়া না করি। অনেক পিতামাতা আছেন যারা নিজেদের সন্তানদের বদভ্যাস শিখিয়ে থাকে। শুরুতে যখন তারা পাপকর্ম আরম্ভ করে তখন তাদের সাবধান করে না। পরিণামে ধীরে ধীরে তারা ধৃষ্ট ও ঔদ্ধত্যপরায়ণ হয়ে ওঠে...। স্মরণ রেখ, তার ঈমান বিশুদ্ধ হতে পারে না, যে সবচেয়ে ঘনিষ্ট সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝে না। এ সম্পর্ক রক্ষা করতে যে অপারগ তার কাছে কীভাবে অন্যান্য সৎকর্মের প্রত্যাশা করা যেতে পারে? সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পোষণের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র

"নিজের সন্তানদের কখনো বেপরোয়াভাবে ঘুরতে দেবেন না। তাদের এমন স্বাধীনতা দেবেন না যাতে তারা আল্লাহ্‌র (বেঁধে দেয়া) সীমা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করে। তাদের কাজকর্ম শৃঙ্খলার মাঝে রাখুন আর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। নিজেদের ছোট ছোট সন্তানদের গৃহপরিচারীকাদের হাতে তুলে দিয়ে একেবারে উদাসীন হয়ে যাবেন না।"

কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾

(সূরা আল্ ফুরকান:৭৫)

সন্তান যদি পূত-পবিত্র ও খোদাভীরু হয় তাহলে সে তাদের ইমাম হবে। মোটকথা এতে মুত্তাকী বা খোদাভীরু হবারও দোয়া রয়েছে।' (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬০-৫৬৩)

শৈশবেই নামাযের অভ্যাস সৃষ্টি করুন আর ধর্ম শিক্ষা দিন

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, 'সন্তানকে ইবাদুর রহমান' (দয়ালু খোদার দাস) হিসেবে গড়ে তুলুন। শিশুকাল থেকেই হৃদয়ে খোদার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করুন। যখন কথা কিছুটা বুঝতে আরম্ভ করে, কোনো জিনিষ দেয়ার সময় তা ছোট-খাট হলেও বলুন, এটি আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এরপর ধীরে ধীরে বোঝান, কোনো কিছু চাইতে হলে আল্লাহ্‌র কাছে চাও। এছাড়া শিশু বয়সেই নামাযের অভ্যাস করানো উচিত। আজকাল অনেক নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী মা নিজেদের সন্তানদের পাঁচ-সাড়ে পাঁচ বছর বয়সেই একবার পবিত্র কুরআন পড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ মা এমন যারা সাড়ে তিন বা চার বছর বয়সেই সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ইচ্ছে পোষণ করেন এবং পাঠিয়েও দেন, আর এই বয়সের শিশুরা বাক্য গঠন করা শিখে যায় এবং লিখতেও আরম্ভ করে। কিন্তু নামায ও কুরআন শেখানোর কথা বললে বলেন, এখনও ছোট। কোন বয়সে শিশুদের নামায পড়তে বলতে এবং শেখাতে হবে তা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

হিশাম বিন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন খবীর জোহ্‌নী'র বাড়ীতে যান। তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করেন, **'শিশুরা কোন বয়সে নামায পড়া শুরু করবে? তিনি বলেন, আমাদের একজন লোক বলেছিলেন, এ বিষয়টি হুযূর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সা.) বলেছেন, শিশু যখন ডান ও বাম হাতের মাঝে পার্থক্য করতে শেখে তখন তাকে নামাযের নির্দেশ দাও।'** (সূনান আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত)

বর্তমান যুগে চার-পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা এই পার্থক্য করা শিখে ফেলে। এরপর আরেকটি হাদীস আছে, হযরত উমর ইবনে শোয়াইব এর বরাতে বর্ণিত, **'তোমরা সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশ দাও আর দশ বছর বয়স হলে তাদের সাথে এ বিষয়ে কঠোর হও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।'** (সূনান আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত)

এই হাদীসে তরবীয়ত বা সন্তানদের শিক্ষা সংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বলে দেয়া হয়েছে, সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও, এ সময় তারা এমন বয়োসন্ধিতে উপনীত হয় যখন তারা কৈশর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে; কাজেই তাদের বিছানাও পৃথক করে দাও। যতই অসুবিধে হোক না কেন সন্তানদের এ বয়সে পৃথক শোয়া উচিত। এখন তাদের বিছানা পৃথক করে দিন তাহলে অনেক রোগ-ব্যাধি ও দোষ-ত্রুটি হতে সন্তানদের নিরাপদ রাখতে পারবেন। লজ্জাবোধ ও পর্দা সম্পর্কে তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। আর এটি সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক, কেননা লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। অতএব কোন বয়সে সন্তানদের মাঝে নামাযের অভ্যাস গড়তে হবে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে – তা আমি বিভিন্ন হাদীসের আলোকে উল্লেখ করলাম।

এ প্রসঙ্গে এবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর লেখা হতে একটি উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনাচ্ছি। তিনি (রা.) বলেন, 'আরেকটি ব্যাধি হলো, অন্য সবকিছু শৈশবে শেখানোর আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় ঠিকই কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়, সন্তান বড় হয়ে শিখে নেবে; এখন প্রয়োজন কী? পক্ষান্তরে পিতামাতা তাকে তখন স্কুলে পাঠিয়ে দেয় যখন সন্তান ভালমন্দের পার্থক্যও বোঝে না আর ডাক্তারেরও নিষেধাজ্ঞা থাকে, এখনই পড়তে পাঠিও না। তাদের আকাঙ্ক্ষা এটিই হয়ে থাকে, যে বয়সে সে ক্রমশঃ বুঝতে শিখছে এখনও সে কিছু না কিছু পড়া শিখুক। কিন্তু, নামাযের বেলায় যখন সে সাবালক হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে তখনও একথাই বলে, এখনও ছোট– বড় হয়ে শিখবে। সন্তানদের নামাযের জন্য জাগাতে বললে উত্তর দেয়, জাগিও না– ওর ঘুম নষ্ট হবে। কিন্তু পরীক্ষার জন্য যদি সকালে ইন্সপেক্টর বা পরীক্ষক আসার থাকে, তাহলে সারা রাত জাগিয়ে রাখবে।

মোটকথা, ইন্সপেক্টরের সামনে যাবার বেলায় কতটা উদ্বিগ্ন থাকে, কিন্তু খোদার সামনে যাবার জন্য জাগ্রত করার কথা মাথায় আসে না। কাজেই সন্তানদের বাল্যকালেই ধর্ম শেখানো উচিত।

যারা সন্তানদের শৈশবে ধর্ম শিক্ষা দেয় না তাদের সন্তানরা বড় হয়েও ধর্ম শিখে না। সমস্যা হচ্ছে, পার্থিব কাজের জন্য যেটিকে পরিপক্কতার বয়স মনে করা হয়, ধর্মের ক্ষেত্রে সেটি মনে করা হয় না। শৈশবে যদি সন্তান কোনো জিনিষ নষ্ট করে তাহলে তাকে ধমকানো হয়, কিন্তু খোদার ধর্ম নষ্ট করলে কিছুই বলা হয় না। অতএব বাল্যকালই ধর্মশিক্ষার সময়, এটি যতক্ষণ পর্যন্ত পিতামাতা না বুঝবেন আর তারা এটি অনুধাবন না করবেন যে, শিশুকালেই সন্তানদের ওপর আমাদের প্রভাব পড়তে পারে, ততদিন তাদের জন্য ধার্মিক হওয়া সম্ভব নয়। আর নারীরা যতদিন পর্যন্ত পুরুষের মত না ভাববে, ততদিন শিশুরা ধার্মিক হতে পারবে না। কেননা, পুরুষরা সার্বক্ষণিক সন্তানদের সঙ্গে থাকে না।

শিশুরা বেশীরভাগ সময় মায়েদের কাছেই থাকে। ধার্মিক মায়েরাও সন্তানদের ধর্ম শেখানোর ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন করে, এমনটিও চোখে পড়েছে। নামাযের সময় সন্তান ঘুমিয়ে থাকলেও বলে, আরো একটু ঘুমিয়ে নাও। কাজেই শৈশবই সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার আসল সময়; এটি যতক্ষণ পর্যন্ত মায়েদের হৃদয়ে বদ্ধমূল না হবে ততদিন পর্যন্ত কোনোভাবেই সফলতা আশা করা যায় না।

অতএব, প্রথম উপদেশ হচ্ছে, শৈশবেই সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করুন, আর শিশুকালেই তাদের ধর্মশিক্ষা দিন যাতে তারা সত্যিকার অর্থে ধার্মিক হিসেবে বেড়ে ওঠে।' (আলইযহার লিযওয়াতিল খমার পৃ:১২৭)

একেবারে শিশু বয়সে নামায পড়া শেখানো সম্পর্কে একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, **'আমি আমার খালার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি। রাতের বেলা মহানবী (সা.) নামাযের জন্য দাঁড়ান। আমিও হুযূরের সঙ্গে তাঁর বাঁ দিকে**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সন্তানদের শাস্তি দেয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একবার অভ্যাসবশে একজন তার সন্তানকে মারলে তিনি তাকে ডেকে মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেন, 'আমার মতে বাচ্চাদের এভাবে মারা শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ, কঠোর স্বভাবের মারধরকারী হিদায়াত ও প্রতিপালনের কাজে অংশীদার সাজতে চায়। যদি কোনো ব্যক্তি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন, সংযমী, ধৈর্যশীল, সহনশীল, ধীর-স্থিও ও গাম্ভীর্যেও অধিকারী হয় তাহলে কোনো উপযুক্ত সময়ে সীমার মধ্যে থেকে সে সন্তানকে শাস্তি দেয়ার বা চোখ রাঙ্গাবার অধিকার রাখে। ... কিন্তু হায়! যতটা শাস্তি দেয়ার চেষ্টা করা হয়, সেভাবে যদি দোয়া করত আর সন্তানদের জন্য বিগলিত হৃদয়ে দোয়া করাকে এক প্রকার আবশ্যক জ্ঞান করত! কেননা, সন্তানের পক্ষে পিতাতামার দোয়া বিশেষভাবে গৃহীত হয়।'

দন্ডায়মান হই, হুযূর আমার মাথা ধরে আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করান।' (বুখারী শরীফ-কিতাবুল আযান)

একথা বলেন নি, কেন আমার সঙ্গে দাঁড়িয়েছ। অধিকন্তু, এটি জানিয়ে দিলেন, যদি দু'জন থাকে তাহলে দ্বিতীয়জন ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে।

এরপর হযরত আবু ইয়াকুব (রা.) আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি মুসাব বিন সা'দকে একথা বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতার সঙ্গে নামায পড়ি, রুকুতে যাবার সময় আমি আমার দু'হাত একত্রে দুই উরুর মাঝখানে রাখি। আমার পিতা আমাকে এমনটি করতে বারণ করেন, তিনি বলেন, আমরা এমনটি করতাম কিন্তু আমাদের তা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, আর আমাদের হাত হাঁটুর ওপর রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' (বুখারী -আযান অধ্যায়)

এগুলো ছোট-খাটো বিষয় যা একেবারে শিশু বয়সে সন্তানদের শেখানো উচিত।

এরপর সন্তানদের তরবীয়ত বা সুশিক্ষার জন্য তাদের জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষা রয়েছে, এক্ষেত্রে আজকাল অনেক চেষ্টা করা হয় আর করা উচিতও; যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম "আমার অনুসারীরা জ্ঞান ও তত্ত্বে উৎকর্ষতা লাভ করবেন।"– আমাদের মাঝে পূর্ণ হয়। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় জ্ঞানই এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমি এমন কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলছি যা সচরাচর চোখে পড়ে। এখানেও অনেক মা আছেন (অন্যত্রতো আছেই) যারা একমাত্র সন্তান বা একমাত্র ছেলে হিসেবে বেশি আহলাদের কারণে ছেলের বিভিন্ন অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া পূরণ করে তাকে নষ্ট করে, অথচ ছেলে যথেষ্ট মেধাবী আর প্রথমদিকে লেখাপড়ায় ভালোও হয়ে থাকে। কিন্তু এতে সে পড়াশুনা ও অন্যান্য কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, আর ধীরে ধীরে পরিবার ও সমাজের গলগ্রহ হয়ে পড়ে। তখন পিতা-মাতা চিন্তিত হয়ে পড়েন, আমাদের একটি মাত্র সন্তান সেও বখে গেলো; হুযূর দোয়া করুন যাতে সে ঠিক হয়ে যায় আর তার সংশোধন হয়। অতএব, প্রথমেই যদি এদিকে দৃষ্টি দেয়া হতো তাহলে পরিস্থিতি এমন হতো না। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা এমন সন্তানদেরও সংশোধন করুন, তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আর তাদের মাধ্যমে পিতা-মাতা প্রশান্তি লাভ করুন। কিন্তু আমি যা বলছিলাম তা হচ্ছে, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিও অনেক বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। আর বিশেষভাবে আজকাল পুরো বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থাই পার্থিবতায় নিমজ্জিত। কাজেই সন্তানদের নিজেদের ঘরের পরিবেশে আরো কাছে টেনে আনার চেষ্টা করা উচিত। সন্তানদের সঙ্গে পিতামাতার ব্যবহার এমন হওয়া উচিত, যাতে সন্তান পিতা-মাতার সঙ্গকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক মনে করে, আর পিতামাতাকেও সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করা উচিত, যাতে সন্তান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের তরবীয়তের অধীন থাকে।

সন্তানদের জামা'তের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন

আমাদের জামা'তের প্রতি এটিও আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ অনুগ্রহ, জামা'তের কল্যাণে এবং ব্যবস্থাপনার বরকতে আমাদের রয়েছে জামা'তের মূল সংগঠন এবং অঙ্গ-সংগঠনের সুবিধাদি। তরবীয়তি বা শিক্ষামূলক ক্লাস ও ইজতেমা হয় এবং জলসা ইত্যাদি হয়ে থাকে, এতে সন্তানদের তরবীয়ত বা সুশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তারাই লাভবান হয় যারা সন্তানদের বিভিন্ন মিটিং বা সভায় প্রেরণ করে, আর যারা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে পুরো সহযোগিতা করে, যারা নিজেদের সন্তানদের জামা'তের ব্যবস্থাপনা, মসজিদ ও মিশনের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত রাখে। অনেক মা সন্তানদের এ খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে জামা'তের সভা ইত্যাদিতে পাঠান না যে, সেখানে গিয়ে তারা অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে নানারকম আজে-বাজে কথা ও অভদ্রতা শিখে। জানি না, তারা অভদ্রতা বা বাজে কথা শেখে কি না তবে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে এমন সন্তানরা বড় হয়ে ধর্ম থেকেও দূরে সরে যায়, এমনকি তারা পিতামাতারও কোনো কাজে আসে না। তাই নোংরা পরিবেশ থেকে রক্ষার জন্য সন্তানদের

জামা'তের পরিবেশের সাথে যুক্ত করে রাখুন।

নিম্নের হাদীসটি দৃষ্টিপটে রাখুন, এটি মুসলিমের হাদীস। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'প্রতিটি শিশু ইসলামী স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, পরে তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা মজুসী বানায় (অর্থাৎ আশপাশের পরিবেশ হতে শিশুর মন-মস্তিষ্ক প্রভাব গ্রহণ করে) উদাহরণস্বরূপ দেখ, পশুর বাচ্চা সুস্থ-সবল জন্ম নেয়, এর মধ্যে কোনোটাকে তোমরা কানকাটা দেখতে পাও কী?'** (অর্থাৎ পশুর বাচ্চাগুলোতে পরবর্তীতে ত্রুটি বা খুঁত সৃষ্টি করা হয়)। (সহীহ্ মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, 'এটি একেবারেই খাঁটি কথা, মানুষ পবিত্র প্রকৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তবে, এতেও কোনো সন্দেহ নেই, পিতামাতার প্রভাবে কেউ কেউ পাপের প্রবণতাও নিয়ে আসে। আসল কথা হলো, প্রকৃতি ও প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতি বা স্বভাব হচ্ছে সেই উপকরণ যাকে বিবেক বলা হয়। আর এটি সর্বদা পবিত্র থাকে, কখনো কলুষিত হয় না। তা সে ডাকাত বা হন্তারকের ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার প্রকৃতি সঠিক হবে। কিন্তু যদি তার পিতামাতার ধ্যান–ধারণা নোংরা থেকে থাকে আর সেই ধ্যান-ধারণার কোনো প্রভাব কোনো সময় তার ওপর পড়ে তাহলে সে সহজেই তা গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যাবে; যেমনটি বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

যেসব রোগ বদ্ধমূল হয় এবং শরীরের অংশ হয়ে যায় তার প্রভাব সন্তানদের ওপর এমনভাবে পড়ে যে, এসব রোগের কারণগুলো সৃষ্টি হওয়া মাত্র তারা তুলনামূলকভাবে দ্রুত এর প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে। পিতামাতার কাছ থেকে শিশু এই যে প্রভাব গ্রহণ করে, তা মূলত সেসব চিন্তাধারার ফসল যা পিতামাতার মন-মস্তিষ্কে তাদের পরস্পর মিলিত হওয়ার সময় মাথা চাড়া দেয়। যদিও এই প্রভাব খুবই হাল্কা বা ক্ষীণ হয়ে থাকে আর বাইরের প্রভাব একে একেবারেই মুছে দেয়, কিন্তু ইসলাম এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভাবকে পুণ্যে রূপ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। আর তা করেছে পিতামাতাকে উপদেশ দেয়ার মাধ্যমে, অর্থাৎ যখন তোমরা পরস্পর নিভৃতে মিলিত হও তখন এই দোয়া কর, 'আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাকতানা' (মিশকাত) অর্থাৎ হে খোদা! আমাদের বাজে চিন্তাধারা এবং নোংরা সংকল্প আর এসবের উস্কানীদাতা লোকদের হাত থেকে নিরাপদ রাখ, আর আমাদের যে সন্তান হবে তাদেরও এসব থেকে নিরাপদ রাখ।' (আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম, পৃ: ১৬৩-১৬৪)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য বাল্যকালই উপযুক্ত সময়।' (অর্থাৎ শিশুকাল খুবই উপযুক্ত এবং উপযোগী।) 'দাঁড়ি গজানোর বয়সে 'যারাবা+ইয়াযরিবু' (আরবী মূলধাতু) মুখস্ত করতে বসলে কিইবা লাভ হবে। শৈশবে স্মরণশক্তি প্রখর থাকে। মানব জীবনের অন্য কোনো পর্যায়ে এমন স্মরণশক্তি আর থাকে না।'

তিনি বলেন, শৈশবের বিভিন্ন কথা এখনও আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে, কিন্তু (আজ থেকে) পনের বছর পূর্বের কথা, বেশীরভাগ মনে নেই। এর কারণ হল, প্রথম বয়সে অর্জিত জ্ঞান মস্তিষ্কে এমনভাবে নিজের স্থান করে নেয় এবং শক্তি-বৃত্তির দৃঢ়তার ফলে এমনভাবে হৃদয়ে গেঁথে যায়, তা আর কখনো নষ্ট হতে পারে না। যাহোক, এটি একটি ব্যাপক বিষয় এক কথায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে এ বয়সের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ প্রয়োজন; আর তা হলো শুরু থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া উচিত আর প্রথম থেকেই আমার এই ইচ্ছে ছিল এবং এখনও আছে। আল্লাহ্ তা'লা এটি পূর্ণ করুন। তোমাদের প্রতিবেশী জাতিগুলোকে দেখ! অর্থাৎ আর্যরা শিক্ষার জন্য কত কি করেছে, কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে, কলেজের বিশাল ভবন এবং আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র জোগাড় করেছে। মুসলমানরা যদি নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য পুরো মনোযোগ না দেয় তাহলে আমার কথা শুনে রাখ! এক সময় সন্তানারও তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে থাকবে।' (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ:৪৪-৪৫)

সন্তানদের জন্য উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করুন

যেমনটি পূর্বেও আমি বলেছি, জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াও সন্তানদের মসজিদের সঙ্গে, ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করুন, যাতে তারা ভালো পরিবেশ পায়। এমন পরিবেশ যা খোদা ও খোদার রসূলের ভালবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি করবে, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টিকারী পরিবেশ হবে। যারা ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন আপনাদের নিশ্চয় এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র হিজরতের পর যেসব ছেলেমেয়ে মসজিদে আসা আরম্ভ করেছে, ব্যবস্থাপনা ও হুযূরের সাহচর্য থেকে লাভবান হয়েছে, তাদের জীবন-ধারা পাল্টে গেছে। আর ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় দিক থেকেই তারা সফল হয়েছে। সকল পিতামাতার এই অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং নির্দ্বিধায় তারা তা স্বীকারও করেন। কাজেই, যেসব ছেলেমেয়ে বাইরে যায় তাদের ব্যাপারে আপনাদের জানা থাকতে হবে, তারা কোথায় যায়। যদি খেলার মাঠে যায় তাহলে (খেলা শেষে) যেন সোজা ঘরে ফিরে আসে। যদি স্কুলে যায় তাহলে দেখতে হবে তাদের ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়ছে না তো? অবশ্য এখন প্রাচ্যের অবস্থাও পাশ্চাত্যের মতই। মোটকথা, নামসর্বস্ব আধুনিক আলোর আগ্রাসন পিতামাতার জন্য গভীর চিন্তার বিষয়। অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আহমদী মায়েদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, **'আমি বিশেষভাবে আহমদী মায়েদের এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনারা নিজেদের ছোট্ট শিশুদের মাঝে খোদার ইবাদতের প্রেরণা সৃষ্টি করুন আর এজন্য সদা চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। তাদের সামনে কখনো এমন কথাবার্তা বলবেন না যার ফলে কোনো বদভ্যাস সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে। অজ্ঞতার কারণে যদি সন্তান ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে বারণ করা উচিত। আর সদা এই চেষ্টাই করুন যেন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা তাদের হৃদয়ে গেঁথে যায়।**

নিজের সন্তানদের কখনো বেপরোয়াভাবে ঘুরতে দেবেন না। তাদের এমন স্বাধীনতা দেবেন না যাতে তারা আল্লাহ্‌র (বেঁধে দেয়া) সীমা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করে। তাদের কাজকর্ম শৃঙ্খলার মাঝে রাখুন আর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। নিজেদের ছোট ছোট সন্তানদের গৃহপরিচারীকাদের হাতে তুলে দিয়ে একেবারে উদাসীন হয়ে যাবেন না।' আজকাল কোনো কোনো দেশে ঘরের

চাকর-বাকররা মুসলমানও হয় না, কিন্তু তাদের কাছে মেয়েদের রেখে যাওয়া হয় আর তারাই এদের মাঝে বিকৃতি সৃষ্টি করে।

অথবা এমন কর্মচারী হয়ে থাকে যাদের ধর্মের কোনো জ্ঞানই থাকে না। তিনি বলেন, **'কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে একেবারে উদাসীন হয়ে যেও না, কেননা প্রাথমিক এই ঔদাসিন্যের কারণেই বিভিন্ন প্রকার বদভ্যাস সৃষ্টি হয়। মা সন্তানকে বাইরে পাঠিয়ে উৎফুল্ল হয়ে যায় যে আমি কিছুটা অবসর পেয়েছি, কিন্তু তার সন্তান কি ধরনের সঙ্গ বা কার কার সাহচর্য পাচ্ছে আর বিভিন্ন দৃশ্য তার ভেতর কোন্ কোন্ বা কেমন ক্ষতিকর ছাপ রেখে যাচ্ছে তা সে জানে না; যা তাঁর অনাগত জীবনের জন্য চরম ক্ষতিকর হতে পারে। কাজেই, সাবধানতা অবলম্বন কর, কেননা এ সময়ের সামান্য সতর্কতা ভবিষ্যতের অনেক ঝুঁকি থেকে রক্ষা করবে। স্বয়ং পুণ্যবতী ও ধার্মীক হও যাতে তোমাদের সন্তানরাও বড় হয়ে পুণ্যবান ও ধার্মিক হতে পারে।'** (আল্ ইযহার লিযাওতাল খমার, পৃ:২)

যেভাবে বলা হয়েছে, সন্তানদের তরবীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তাদের চলাফেরা-ওঠাবসার পরিবেশ কেমন তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। এ সম্পর্কে আগেও বলেছি, বাড়ীতে সন্তানদের এমন পরিবেশ দিন যাতে তারা বেশীরভাগ সময় পিতামাতার সাহচর্যে অতিবাহিত করে। কিন্তু সন্তানদের স্কুলেও যেতে হবে, খেলতে হবে আর বন্ধুদের সঙ্গেও চলাফেরা করতে হবে। বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবেশ সন্তানদের কর্মকান্ডের ওপর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। সচরাচর এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়, আমাদের অধিকাংশ বই-পুস্তকেও রয়েছে আর আপনারাও শুনে থাকবেন, কলেজের এক ছাত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে বলে, আমার চিন্তা-ভাবনায় নাস্তিকতার প্রভাব পড়ছে। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে বললে তিনি (আ.) বলেন, তাকে বল সে কলেজে যে স্থানে বা আসনে বসে তা পরিবর্তন করতে। আর স্থান পরিবর্তনের ফলে তার চিন্তা-ধারায় পরিবর্তন আসে। পরে জানা যায়, কলেজে যে ছেলের পাশে তার আসন ছিল সে ছিল নাস্তিক-মনোভাবাপন্ন। কোনো কথাবার্তা ছাড়াই নাস্তিক চিন্তা-ধারার প্রভাব সেই মুসলমান ছেলের ওপর পড়ছিল। বোঝা গেল, পরিবেশ-পরিস্থিতি যেখানে প্রকাশ্যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সেখানে নীরবে-অজান্তেও তা মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে ।

একটি হাদীস আছে, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'মানুষ তার বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি রাখা উচিত, সে কেমন বন্ধু নির্বাচন করছে?'** (তিরিমিযী)

সন্তানদের অন্যায়ভাবে প্রশ্রয় দেয়া থেকে বিরত থাকুন

এছাড়া আরেকটি জরুরী বিষয় সন্তানদের তরবীয়ত বা শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে মেয়েদের তরবীয়তের ক্ষেত্রে আবশ্যক– তা হলো, অধিকাংশ পিতামাতা ছেলেদের বেশি গুরুত্ব দেয়। অনেকে তো পোষাক-আষাক এবং পানাহার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ছেলেদের অগ্রাধিকার প্রদান করে আর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায়। ছেলে যদি বোনের ওপর হাত ওঠায় তাহলে হয় তাকে কিছু বলা হয় না, (মনে করা হয়) ঝগড়া করেছে এটি কোনো ব্যাপার না।

কিন্তু যদি বোন ভাইকে মারে তাহলে সে শাস্তি পায়। অথবা এমন পিতামাতা ছেলেদের বাঁধা দিলেও তা এমনভাবে করে যে, বাঁধা দেয়া বা না দেয়া সমান কথা। কাজেই এমন ছেলে প্রশ্রয়ের কারণে উচ্ছন্নে যেতে থাকে আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এমন ছেলেরা অলস ও অকর্মণ্য হয়ে ঘরে বসে থাকে অথবা বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এক গ্লাস পানি খেতে হলেও দু'ফুট হেঁটে গিয়ে তা পান করতে পারে না। মা'কে বলে, পানি দাও, অথচ পিতামাতা নির্বিকার দেখতে থাকেন, কিছু বলার কেউ নেই। এটি কোনো ছোটখাট বিষয় নয়, বড় হলে এর ভয়ানক পরিণাম দেখা যায়।

এমন সন্তান পিতামাতার জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়। তারা চিন্তায় পড়ে যায়, আমাদের পরে এর কি হবে? আর পিতামাতা যদি সম্পদশালী হয় তাহলে এই চিন্তার উদ্রেক ঘটে, আমাদের পর এসব সম্পত্তি সে উড়িয়ে ফেলবে। এরা সমাজেরও বোঝা হয় আর জামা'তের জন্য সর্বদা সমস্যা সৃষ্টির কারণ হয়। আর শৈশব থেকেই যেহেতু বোনদের দমন করে রাখা এবং তাদের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার অভ্যাস সৃষ্টি হয় তাই সম্পত্তিতে বোনদের অংশও ভক্ষণ করে। এরপর আর্থিক অস্বচ্ছলতা ছাড়াও অনেক মেয়ে (বাপের বাড়ি থেকে) কিছু না আনার কারণে শ্বশুর বাড়ী এবং স্বামীর কাছ থেকে খোঁটা বা পীড়াদায়ক কথা শুনতে থাকে। অতএব পিতামাতার সামান্য ভুলের কারণে এমন এক ভয়াবহ শয়তানী চক্র সৃষ্টি হয় যা সুদূরপ্রসারী অশুভ পরিণতির কারণ হয়ে থাকে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর একটি খুব সুন্দর উপদেশ হচ্ছে, 'সন্তানদের এমন তরবীয়তের চেষ্টা কর যেন তাদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সৎসাহস, বীরত্ব, আত্মসম্মানবোধ এবং সুস্বাধীন মনোভাব গড়ে ওঠে। একদিকে তাদের মানুষ বানাও, অপরদিকে মুসলমান।' (খুতবাতে নূর, পৃ:৭৫)

হযরত আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, সন্তানদের সাথে সম্মানসূচক ব্যবহার কর এবং তাদের উত্তম তরবীয়ত কর।' (সূনান ইবনে মাজাহ্)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছিলেন, 'যারা নিজেদের সন্তানদের সঙ্গে শুরু থেকেই সম্মানজনকভাবে কথা বলেন, তাদের সন্তানরা বড় হয়ে তাদের সম্মান করে আর ঘরের বাইরে অন্যদের সাথেও সম্মানজনক আচরণ করে; আর এই ধারা বংশ পরম্পরায় অব্যাহত থাকে। এজন্য সন্তানদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বশত অকারণে বকাঝকা বা ভর্ৎসনা করা উচিত নয়। আর যতটুকু সম্ভব তাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার কর।'

কিন্তু এরও ভুল অর্থ করা হয়। সম্মানজনক ব্যবহারের অর্থ কোনোভাবেই তা নয় যা অনেকেই ভুলবশত মনে করে অর্থাৎ কিছু বলবে না। যেখানে সম্মান করার নির্দেশ রয়েছে সেখানে উত্তম তরবীয়ত বা প্রতিপালনেরও আদেশ রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সকল বিষয়ে কঠোর হবেন না বরং মন্দকাজ করে ফেললে সন্তানদের বোঝাবেন, কেননা এটি তরবীয়তের অংশ।

কোনো বিষয়ে মানুষের সামনে বকাঝকা করলে সন্তানের ওপর মনস্তাত্ত্বিক বিরূপ প্রভাব পড়ার আশংকা থাকলে সেক্ষেত্রে তাকে স্নেহের সঙ্গে বুঝিয়ে দেবেন। মন্দ

কাজ থেকে বিরত রাখা সন্তানের সংশোধনের কারণ হয়। মোটকথা কিছু ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে যার প্রতি মা দৃষ্টিই দেয় না, মনোযোগই দেয় না আর এটি কোনো বিষয়ই না– ভেবে তা উপেক্ষা করে।

উদাহরণস্বরূপ কারো বাড়ীতে গেলে তাদের জিনিষ পত্র হাতাতে আরম্ভ করে অথবা চকলেট ও অন্য কোনো জিনিষ খেয়ে পর্দা বা সোফায় মুছে ফেলে বা চেয়ারে হাত মুছে নেয়। বাড়ীর লোকেরা ভেতরে ভেতরে কষ্ট পায় আর চায় যে, এমন পরিস্থিতিতে মায়ের কোনোভাবে তার সন্তানকে বারণ করা উচিত। কিন্তু মা এর প্রতি মনোযোগই দেয় না, দেখার প্রয়োজন মনে করে না অথবা দেখেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। মনে করে, যদি এখন আমি কিছু বলি তাহলে বাচ্চার আত্মসম্মানে লাগবে আর সে লজ্জা পাবে। এটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত রীতি।

এছাড়া অনেক সময় এমনও হয়, বাচ্চা কোনো প্রকার দুষ্টুমি করে, অকারণে অন্য কোনো বাচ্চাকে মারে অথবা কারো কোনো জিনিষ ভেঙ্গে ফেলে, তখন পিতামাতা বাচ্চাকে বলে, তুমি কেন এমনটি করলে? কিন্তু তাদের চেহারার হাব-ভাব এবং ঠোটে বিরাজমান চাপা মুচকি হাসি (সন্তানকে) বলে, এটি কোনো ব্যাপার নয়। মনে রাখবেন, বাচ্চারা খুবই বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, তারা এসব ব্যবহার দেখে, আর নিজেদের পিতামাতার সকল প্রকার স্বভাব সম্পর্কে অবহিত। এভাবে তাদের তরবীয়ত হওয়ার পরিবর্তে আরো উশৃংঙ্খলতা দেখা দেয়। এমন ক্ষেত্রে মারধর করার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে চেহারায় কিছুটা কঠোরতা প্রকাশ করা উচিত যাতে বাচ্চাদের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি হয়, আমি ভুল কাজ করেছি।

এরপর ধর্মীয় বিষয়ে শিশুকাল থেকেই তাদের হৃদয়ে এর গুরুত্ব, ভালবাসা ও সম্মান সৃষ্টি করুন। অনেক সময় বাচ্চারা জিদ করে খুবই অপছন্দনীয় কথা বলে বসে। এমন পরিস্থিতিতে সন্তানদের বোঝানোর জন্য পিতামাতার কিছুটা শক্ত হতে হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেখানে সর্বদা এই উপদেশ দিচ্ছেন, সন্তানদের সাথে কোমল ব্যবহার করো সেখানে নিম্নের দৃষ্টান্তও রয়েছে।

হযরত আম্মা জান (রা.) বর্ণনা করেছেন, **'একবার তিনি রেহেলের ওপর রেখে কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন, মিয়াঁ মুবারক সাহেব তখন ছোট্ট শিশু ছিলেন, তাকে কোনো কাজের জন্য বলেন আর সে জিদ করে রেহেলটিকে ধাক্কা দিয়ে বলে, প্রথমে আমার কাজ করে দিন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বেআদবী দেখে তাকে থাপ্পর মারেন।'**

মোটকথা, ঘটনা থেকে প্রতিভাত হয়, ধর্মের বিষয়ে কোনো ছাড় নেই। যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সন্তানদের শাস্তি দেয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একবার অভ্যাসবশে একজন তার সন্তানকে মারলে তিনি তাকে ডেকে মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেন, **'আমার মতে বাচ্চাদের এভাবে মারা শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ, কঠোর স্বভাবের মারধরকারী হিদায়াত ও প্রতিপালনের কাজে অংশীদার সাজতে চায়। যদি কোনো ব্যক্তি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন, সংযমী, ধৈর্যশীল, সহনশীল, ধীর-স্থিও ও গাম্ভীর্যেও অধিকারী হয় তাহলে কোনো উপযুক্ত সময়ে সীমার মধ্যে থেকে সে সন্তানকে শাস্তি দেয়ার বা চোখ রাঙ্গাবার অধিকার রাখে। ... কিন্তু হায়! যতটা শাস্তি দেয়ার চেষ্টা করা হয়, সেভাবে যদি দোয়া করত আর সন্তানদের জন্য বিগলিত হৃদয়ে দোয়া করাকে এক প্রকার আবশ্যক জ্ঞান করত! কেননা, সন্তানের পক্ষে পিতাতামার দোয়া বিশেষভাবে গৃহীত হয়।'** (মলফুযাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮-৩০৯)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'হিদায়াত এবং সত্যিকার তরবীয়তের কাজ মূলত আল্লাহ্ তা'লার। নাছোড় বান্দার মত পেছনে লেগে থাকা এবং এবং কোনো বিষয়ে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা অর্থাৎ পদে পদে বাচ্চাদের বাঁধা দেয়া, বকাঝকা করা প্রকাশ করে, যেন আমরাই হিদায়াত দেয়ার মালিক বনে বসেছি আর আমরা নিজেদের পছন্দের পথে তাকে নিয়ে আসব! এটি এক প্রকার সুপ্ত শির্‌ক। আমাদের জামা'তের উচিত এথেকে বিরত থাকা। আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য দোয়া করি আর মোটামুটি ভদ্রতা ও শিষ্টাচার এবং শিক্ষার নিয়ম-নীতি অনুসরণ করিয়ে থাকি; এর চেয়ে বেশি নয়। এরপর আল্লাহ্‌র ওপর পুরো ভরসা করি। যার মাঝে সৌভাগ্যের যতটুকু বীজ থাকবে সে যথাসময় সবুজ-সতেজ হয়ে উঠবেই।' (মলফুযাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮-৩০৯)

চারিত্রিক শিক্ষা-দীক্ষার রীতি

উন্নত চরিত্র গঠন সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) খুবই হৃদয়গ্রাহী একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন, **'অনেকে সন্তানদের ভয় দেখানোর জন্য হাত উঠিয়ে বলে, মারবো? আমি দেখেছি, দু'একবার এমন করলে বাচ্চাও একই ভঙ্গিতে হাত উঠিয়ে বলে, মারবো? একইভাবে কিছু নির্বোধ নিজেদের সন্তানদের গালি-গালাজ করে। এরপর বাচ্চারাও গালি-গালাজ আরম্ভ করে। অনেক মহিলা নিজেদের সন্তানদের সঙ্গে সর্বদা গোমরা মুখ ও ভ্রুকুঞ্চিত করে কথা বলে, এতে তাদের সন্তানরাও মুখ গোমরা করে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এর বিপরীতে যেসব মহিলা হাসিখুশী থাকে, সন্তানদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে অভ্যস্ত, তাদের সন্তান-সন্ততিরাও হাসিখুশী থাকে। সন্তানদের সঙ্গে মায়েদের এমন ব্যবহার করা উচিত যার অনুকরণের কল্যাণে তারা জীবনভর লাঞ্ছনা ও অসম্মানের মুখোমুখি হবে না, বরং চিরতরে তাদের আচার-ব্যবহারের সংশোধন হয়ে যাবে।'**

অতএব সন্তানদের উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। এরপর উত্তম চরিত্রের একটি দিক হলো সহনশীলতা। কাজেই শিশুকাল থেকেই এ বিষয়ের প্রতি পিতামাতার মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। ছোট ছোট এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা পরিহার করলে বাচ্চাদের কান্নাকাটি ও অকারণে ঘ্যান ঘ্যান করার যে অভ্যাস রয়েছে তা দূর হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বাচ্চার দুধ পান বা খাবারের সময় মা কাজ করছেন এমন সময় বাচ্চা দুধ বা খাবার চায়, মা বলেন, একটু অপেক্ষা কর আমি হাতের কাজটি শেষ করেই তোমাকে দিচ্ছি। এমতাবস্থায় বাচ্চা দু'মিনিট হয়তো ধৈর্য ধরবে তারপর কান্নাকাটি আরম্ভ করবে। অনেক সময় এমনভাবে কান্না শুরু করে দেয় যেন মহা বিপদ এসে গেলো। দু'তিনবার যদি এমন হয় তাহলে বাচ্চা বুঝে যায়, এখন আমার যা-ই চাইতে হয়, যে কাজই করবো বা আদায় করবো তা কান্নাকাটি ছাড়া সম্ভব হবে না। এভাবে ধীরে ধীরে বাচ্চার স্বভাবের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে আর সে অজান্তে রাগ ও জিদের প্রভাবাধীন অবস্থায় বড় হতে থাকে।

এরপর কিছু পিতামাতা কোনো সন্তানকে বেশি আদর করে আর কোনটাকে কম। আর এই পার্থক্য অনেক সময় এত বেড়ে যায়, চতুষ্পার্শ্বের লোকজনও তা জানতে পারে। এরফলেও সন্তানদের ভেতর জিদ এবং নিজের ভাই-বোনের বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে একপ্রকার উষ্মা জন্ম নিতে থাকে যা বড় হয়ে অনেক সময় ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। যদি মেয়ের মধ্যে এই হীনমন্যতা জন্ম নেয় তাহলে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে নিজের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে অধিকন্তু সন্তানদের তরবীয়তের ক্ষেত্রেও অনেক সময় মন্দ প্রভাব পড়ে। এদের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিস্তার ঘটবে তাই এই হিনমন্যতা তার সন্তানদের ওপরও প্রভাব ফেলে।

একথা স্মরণ রাখবেন, আহমদী মায়ের সন্তান কেবল তার সন্তানই নয় বরং জামা'তেরও সন্তান, আর শুধু জামা'তের সন্তানই নয় বরং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতেরও সন্তান। এরাই তাঁর (সা.) শিক্ষা, উন্নত আচার-ব্যবহার বিশ্বের সামনে তুলে ধরে মানুষের হৃদয় জয় করবে, ইসলামের পতাকাতলে তাদের সমবেত করবে। কাজেই সামান্য ভুল করে বংশধরদের নষ্ট করবেন না।

একটি হাদীসে হযরত নু'মান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমার পিতা আমাকে এক গোলাম বা কৃতদাস উপহার দেন আর হুযূর (সা.)-কে এ বিষয়ে সাক্ষী রাখতে চান, তিনি হুযূর (সা.)-এর কাছে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন, তিনি (সা.) বলেন, তোমার আর কোনো ছেলে আছে কি? তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন! মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার সেই ছেলেকেও গোলাম বা কৃতদাস দান করেছ? তিনি বলেন, না! একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি এমন অন্যায় দানের সাক্ষী হবো না'।' (সূনান আবু দাউদ)

এরপর খাবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি ছোট্ট বদভ্যাস আছে। যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, বাচ্চারা খাবার খাওয়ার সময় এত ময়লা ছড়ায়, যে বাড়ির অতিথি সেই বাড়ীর আসবাবপত্র এবং পর্দার এমন দুরবস্থা করে যে ঘরের লোকেরা তওবা তওবা করে আর সিদ্ধান্ত নেয়, ভবিষ্যতে এই পরিবারকে আর আমাদের ঘরে দাওয়াত দিবো না, বরং হয়ত অন্যদের নিমন্ত্রণ দেয়া হতেও দূরে থাকার অঙ্গীকার করে। আর সেই বাড়ীর সন্তানরা ভদ্র হলেও এদের দেখাদেখি হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ করে, এতে যোগ দেয় যা অতিথিসেবকের জন্য আরো অস্থিরতার কারণ হয়।

কাজেই এগুলো কোনো ছোট-খাট বিষয় নয়; এগুলোকে এ বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না যে, কোনো ব্যাপার না বড় হলে নিজেই আদব-কায়দা শিখে নেবে। বড় হলেই শিষ্টাচার শিখে না। আমি এমন লোকদের দেখেছি, যাদের সঙ্গে বসে খাবার খাওয়াও দুষ্কর; কেননা এরা বড় হলেও তাদের খাবারের বদভ্যাস থেকে যায়। মহানবী (সা.) এগুলোকে ছোট বিষয় মনে করেন নি আর আমাদেরকে ব্যবহারিকভাবে শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। হাদীসে হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন বাঁ হাতে পানাহার না করে, কেননা শয়তান বা হাত দিয়ে পানাহার করে।' (মুসলিম শরীফ)

এরপর মহানবী (সা.)-এর সৎপুত্র হযরত উমর বিন আবি সালমাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, 'শৈশবে আমি মহানবী (সা.)-এর গৃহে থাকতাম, খাবার খাওয়ার সময় আমার হাত ইতস্তত প্লেটের এদিক সেদিক বিচরণ করত হুযূর (সা.) আমার এই অভ্যাস দেখে বলেন, 'হে বৎস! আহারের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করো এবং নিজের ডান হাত দিয়ে খাবার খাও আর তোমার সম্মুখস্ত খাবার খাও। সেই সময় থেকে শুরু করে আমি সর্বদা হুযূর (সা.)-এর উপদেশ অনুসারে আহার করি।' (সহীহ্ বুখারী)

হযরত ইকরাশ (রা.) বর্ণনা করেন, 'বনু মার্‌রাহ্ যাকাতের সম্পদসহ আমাকে হুযূর (সা.)-এর খিদমতে পাঠান। আমি যখন মদিনায় হুযূরের সমীপে উপস্থিত হই তখন হুযূর আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে উপবিষ্ট অবস্থায় সভার সৌন্দর্য বর্ধন করছিলেন। হুযূর (সা.) আমার হাত ধরে উম্মে সালমার ঘরে নিয়ে যান। আর তাকে জিজ্ঞেস করেন খাওয়ার কোনো জিনিষ আছে কি? তিনি ঝোলে ভেজানো রুটির একটি পাত্র দেন যাতে ঝোল ও মাংসের টুকরো ছিল। আমরা এটি থেকে খেতে আরম্ভ করি, আমি কখনো (পেয়ালার) এদিক থেকে আবার কখনো অন্যদিক থেকে খাচ্ছিলাম।

কিন্তু হুযূর তাঁর সম্মুখ থেকে খাচ্ছিলেন। হুযূর নিজের বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাত চেপে ধরে বলেন, হে ইকরাশ! একদিক থেকে আহার করো, কেননা, পুরো খাবার একই ধরনের। এরপর আমাদের সম্মুখে একটি তস্তরী নিয়ে আসা হয় যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার খেজুর বা কাচা খেজুর রাখা ছিল, আমি সামনে থেকে খেতে আরম্ভ করি আর হুযূর (সা.) তাঁর পছন্দ মোতাবেক কখনো এদিক থেকে আবার কখনো অন্যদিকে থেকে বেছে বেছে খান আর বলেন, হে ইকরাশ! তোমার পছন্দ মোতাবেক খাও কেননা, এখানে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ রয়েছে। এরপর পানি আনা হয়। হুযূর (সা.) নিজের হাত ধৌত করেন এবং ভেজা হাত নিজের মুখ-মন্ডল, মাথা ও বাহুতে বুলান আর বলেন, হে ইকরাশ! এটি আগুন দিয়ে রান্না করা জিনিষের অযু,' অর্থাৎ, খাবার শেষে যেন হাত পরিস্কার করা হয়। (তিরমিযী)

এবার দেখুন! এখানে শুধু আহার করার শিষ্টাচারই শেখানো হয়নি বরং এটিও শিখিয়েছেন, খাবার শেষে হাত ধুয়ে নাও। বিশেষভাবে তরকারীর মত খাবার অথবা এমন খাবারের পর যার ফলে তোমাদের হাতে চর্বি লাগে বা হাত তৈলাক্ত হয়ে যায় বা দুর্গন্ধ বের হয়। যারা হাত ধোয় না, তাদের হাত থেকে বা তাদের কাছে বসলে এমন দুর্গন্ধ আসে, খাবারের গন্ধ সুগন্ধি গণ্য হলেও বা আহারের সময় সে ঘ্রাণ ভাল লাগলেও তাদের হাত থেকে যা ছড়ায় তা ভালো লাগে না। কাজেই, মহানবী (সা.) আমাদের এই শিষ্টাচারই শিখিয়েছেন। আর এটি পিতামাতার কাছে সন্তানের অধিকার, তারা যেন এসব বিষয় তাদের পিতামাতার কাছ থেকে শেখে।

একটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, **'একবার হযরত আলীর পুত্র হাসান (রা.) সদকার একটি খেজুর মুখে দেন, এতে হুযূর (সা.) মৃদুস্বরে তাঁকে বলেন, তুমি কি জানো না, আমরা সদকা খাই না।'** (বুখারী শরীফ)

সচরাচর এর এই অর্থ করা হয় আর যথার্থই করা হয়, তিনি (সা.) বলেছেন, আমার জন্য এবং আমার সন্তান-সন্ততির জন্য সদকা হারাম। উপমহাদেশে সৈয়দরা এ বিষয়টি মেনে চলেন। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মাওউদ

(রা.) এর আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, এর অর্থ ছিল, তোমার কাজ হচ্ছে নিজে উপার্জন করে খাওয়া, অন্যের ওপর বোঝা হওয়া নয়। এবার দেখুন! শিশুকালেই তিনি তাঁর দৌহিত্রকে কেমন শিক্ষা দিলেন। কাজেই মায়েরা যদি শিশুকালেই তাদের সন্তানদের মাঝে এই চেতনা জাগ্রত করেন তাহলে আপনি দেখবেন কিছুকাল পর আহমদী সমাজে ভিক্ষা করে খাবার মত কেউ আর বাকী থাকবে না, বরং কিছু করে খাবে এবং খাওয়ানোর মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে।

শিশুদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর স্নেহ, তিনি কীভাবে তাদের শেখাতেন এবং উপদেশ দিতেন এ সম্পর্কে একটি হাদীসে খালেদ বিন সাঈদ এর কন্যা উম্মে খালেদ বর্ণনা করেন, আমি হলুদ রঙের জামা পরে আমার পিতার সঙ্গে হুযূর (সা.)-এর কাছে যাই। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সানাহ্ সানাহ্ অর্থাৎ বাহ্ কি সুন্দর। (সানাহ্ হাবশী শব্দ এর অর্থ হচ্ছে, সৌন্দর্য। অর্থাৎ, এই পোষাকটি তোমাকে খুব সুন্দর মানিয়েছে)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কিছুটা এগিয়ে যাই এবং নবীকুল শিরোমণির সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করি। এতে আমার পিতা আমাকে ধমক দেন। মহানবী (সা.) বলেন, ওকে খেলতে দাও। এরপর হুযূর (সা.) তিনবার বলেন, এই কাপড়গুলো অনেক দিন পরবে, না ছেড়া পর্যন্ত ফেলবে না। (বুখারী শরীফ)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যখন বাচ্চা বরং অল্প বয়সী শিশুও যারা কথা বলাও শেখেনি, যখন কোনো নতুন কাপড় পরিধান করে তখন যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে, তাদেরও অবশ্যই ইঙ্গিতে দেখায়। আর বড়রা নিজেরাই যদি দেখে এবং বাচ্চাদের কাপড়ের প্রশংসা করে, তার জিনিষের প্রশংসা করে তাহলে বাচ্চার খুশীর আর সীমা থাকে না। মহানবী (সা.) যিনি ছিলেন মূর্তিমান স্নেহ, তিনি সবার আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি স্নেহশীল মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর সম্মুখে যখন মেয়েটি যায় তখন পরম স্নেহে তার কাপড়ের প্রশংসা করেন, সে আনন্দিত হয়। প্রায়শঃ দেখা যায়, যখন আপনি বাচ্চাদের প্রশংসা করেন, তাদের সঙ্গে ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেন তখন বাচ্চা আনন্দে খেলাধূলা শুরু করে দেয় আর বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমিও স্বতস্ফূর্ততা প্রদর্শন করি কিন্তু আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তাই এটি তার খারাপ লাগে। পিতা ধমক দিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে শিষ্টাচার প্রদর্শন করো আর এটি এমন স্থান নয় যেখানে তুমি অনবধানে খেলার চেষ্টা করবে; কিন্তু আপাদমস্তক করুণা ও দয়ার সাগর একান্ত স্নেহের সঙ্গে বলেন, ওকে খেলতে দাও। আর খেলাচ্ছলেই এই উপদেশ দিয়ে দেন, পিতামাতার কাছে প্রতিদিন নতুন নতুন পোষাকের বায়না ধরবে না। বরং কাপড় অনেক দিন পর আর পরতে পরতে পুরনো করে ফেল। ভালবাসা ও আদরের সঙ্গে উপদেশও দিয়ে দেন, জাগতিক জিনিষের প্রতি লোভ বা আকর্ষণকে ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দিও না। কাজেই এ হচ্ছে সেই আদর্শ যা প্রত্যেক পিতামাতাকে নিজ সন্তানের তরবীয়তের বেলায় অনুসরণ করা উচিত। সন্তানদের বন্ধু করে নাও, তাদের কাছে টেনে নাও, কাছে আসার সুবাদে স্নেহের সঙ্গে সন্তানদের সদুপদেশও দাও। এমন যেন না হয়, বাচ্চা সামান্য একটু জিদ করলেই নতুন কাপড় কেনার জন্য বাজারে ছুটে যাবে অথবা কোনো জিনিষ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তা দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে যাবে। সন্তানদের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নামে নিজেদের ওপর বোঝা চাপিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়া উচিত নয়। শিশুকালে যেভাবে সন্তানদের শিক্ষা দেবেন সেভাবেই তাদের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

এভাবে স্নেহের সঙ্গে তরবীয়ত করা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁকে একটি উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, শৈশবে আমি একটি তোতা পাখি শিকার করে নিয়ে আসি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটি দেখে বলেন, **'মাহমুদ! এর মাংস হারাম নয় ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সকল জীব-জন্তুই খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নি। কিছু সুন্দর প্রাণী দেখার জন্যও সৃষ্টি করেছেন যেন তা দেখে নয়ন জুড়ায়। কোনো কোনো প্রাণীকে সুরেলা কণ্ঠ দিয়েছেন যেন তাদের শব্দ শুনে মানুষ মুগ্ধ হয়।'** (তারীখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৫১)

হযরত উম্মুল মু'মিনীন সৈয়দা নুসরত জাহান বেগম সাহেবা (রা.) তাঁর সন্তানদের

একথা স্মরণ রাখবেন, আহমদী মায়ের সন্তান কেবল তার সন্তানই নয় বরং জামা'তেরও সন্তান, আর শুধু জামা'তের সন্তানই নয় বরং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতেরও সন্তান। এরাই তাঁর (সা.) শিক্ষা, উন্নত আচার-ব্যবহার বিশ্বের সামনে তুলে ধরে মানুষের হৃদয় জয় করবে, ইসলামের পতাকাতলে তাদের সমবেত করবে। কাজেই সামান্য ভুল করে বংশধরদের নষ্ট করবেন না।

কীভাবে তরবীয়ত করতেন এ সম্পর্কে তাঁর মেয়ে সৈয়দা নবাব মুবারেকা বেগম সাহেবা (রা.)-র বিবরণ হচ্ছে, তরবীয়তের নীতি সম্পর্কে আমি এই এখন পর্যন্ত সাধারণ ও বিশেষ লোকদের শ্রেণীভুক্ত অনেকের লেখা পড়েছি, কিন্তু এক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত আম্মাজানের চেয়ে উত্তম কাউকে পাই নি। তিনি সামান্য উর্দু শেখা ছাড়া জাগতিক তেমন পড়াশুনা করেন নি। কিন্তু আচার-ব্যবহার ও তরবীতের বিষয়ে তাঁর যে নীতি তা দেখে আমি এটিই মনে করি, খোদার বিশেষ কৃপা এবং খোদার মসীহ্‌র তরবীয়ত বৈ অন্য কোনভাবে এটি সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সর্বদা সন্তানদের প্রতি আস্থা, দৃঢ় আস্থা রেখে তাদেরকে পিতামাতার আস্থার সম্মান রাখার বিষয়টি শেখানো এটি তাঁর তরবীয়তের অনেক বড় একটি রীতি ছিল। এছাড়া মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, আত্মসম্মানবোধ ও পরনির্ভর না হওয়ার শিক্ষা ছিল তাঁর প্রথম পাঠ। তিনি আমাদেরকেও সর্বদা একথাই বলতেন, সন্তানদের ভেতর কথা শোনার অভ্যাস সৃষ্টি কর। এরপর বাচ্চারা যদি দুষ্টুমিও করে তাতে কোনো ভয় থাকবে না। যখনই নিষেধ করা হবে তারা বিরত হবে আর এভাবে সংশোধন হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, যদি একবার তুমি তাদের ভেতর কথা শোনার দৃঢ় অভ্যাস সৃষ্টি করে দিতে পারো, তাহলে সবসময় সংশোধনের

আশা রাখা যেতে পারে। এটিই তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, তাই আমরা পিতামাতার অনুপস্থিতিতেও তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো কোনো কাজ করার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না। হযরত উম্মুল মু'মিনীন সব সময় বলতেন, আমার সন্তানরা কখনো মিথ্যা বলে না, আর এই আস্থাই আমাদের মিথ্যা থেকে রক্ষা করত বরং (মিথ্যাকে) অনেক বেশি ঘৃণা করতাম। তিনি বলেন, তিনি কখনো কঠোর হয়েছেন বলে আমার স্মরণ নেই। এরপরও তাঁর একটি বিশেষ প্রতাপ ছিল, তাই আমরা তুলনামূলকভাবে তাঁর চেয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে রীতিবহির্ভূতভাবে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ ছিলাম। অর্থাৎ মায়ের চেয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে বেশি খোলামেলা সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, হুযূর আকদাসের প্রতি আম্মা জানের সীমাহীন ভালবাসা ও সম্মানের কারণে আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালবাসা আরো বেড়ে যেত।

সন্তানদের তরবীয়তের তিনি আরো একটি নীতি বর্ণনা করতেন, প্রথমে সন্তানের তরবীয়তের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করো, দ্বিতীয়ত তোমার আদর্শ দেখে তারা নিজেরাই ঠিক হয়ে যাবে। কাজেই এটি এমন একটি অনুপম নীতি যা অনুশীলনে সত্যিকার অর্থেই সন্তানদের অবস্থা পাল্টে যেতে পারে।

উকাড়ার গ্রাম্য মাতব্বর চৌধুরী গোলাম কাদের সাহেব ১৯০৯ সনে দিল্লিতে সেকেন্ড কেরাণী ছিলেন আর মরহুম হযরত মীর কাসেম আলী সাহেব ছিলেন নায়েব নাযের। তাঁরা উভয়ই দরিয়াগঞ্জের বাড়ীতে একত্রে বসবাস করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিবার সেই দিনগুলোতে এখানে অবস্থান করেন। হযরত মীর সাহেবের মাধ্যমে জানা যায়, হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) তাঁর সন্তান-সন্ততি, পুত্রবধু এবং কন্যাদের ইবাদতের বিষয়ে পুরো সচেতনতার সাথে তত্ত্বাবধান করতেন আর বিশেষভাবে তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা করতেন। সর্বদা পরিবারের সদস্যদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের উপদেশ দিতেন। [সিরাত, হযরত উম্মুল মু'মিনীন নুসরত জাহান বেগম সাহেবা (রা.), পৃ:৩৯৩-৩৯৬]

কাজেই, এখন এই পুরো জামা'তই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিবার। নিজ নিজ সন্তানের তরবীয়ত করা প্রত্যেক মায়ের দায়িত্ব।

অতএব, হে আহমদী মায়েরা! সেসব সৌভাগ্যবান মা, যারা মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে সাড়া দিয়ে এ যুগের ইমামকে চিনেছেন, তাঁর আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন, বিশ্ববাসীর বিরোধিতার ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন এবং এই অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা সর্বদা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেব, আপনারা আত্মজিজ্ঞাসা করুন এবং দেখুন, এই অঙ্গীকার হতে কোথাও দূরে সরে যাচ্ছেন না তো? আমাদের ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি কেবল নিজেদের মাঝেই সীমিত নেই তো? আমরা এটি পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে সঞ্চার করছি কি? আমরা আমাদের বংশধরদের এ বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছি কি? আমাদের কোলে যারা বড় হচ্ছে, তারা খোদার ইবাদতকারী ও সৎকর্মশীলদের মাঝে গণ্য হবার যোগ্য কি?

আল্লাহ্ আমাদের হাতে যে আমানত অর্পণ করেছিলেন আর যে আমানত আল্লাহ্ আমাদের গর্ভজাত করেছেন, আমরা যেন তাদের তরবীয়ত দিয়ে মহানবী (সা.)-এর উম্মতভুক্ত করে আল্লাহ্‌র দরবারে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি; তাদের তরবীয়ত করেছি কি? আমরা এবং আমাদের সন্তানরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হবার যোগ্য কি? যদি এর উত্তর ইতিবাচক হয় তাহলে আপনাদের সাধুবাদ জানাই। আর যদি নেতিবাচক হয় তাহলে এসব কিছু অর্জনের জন্য আপনাকে আত্ম-সংশোধন করতে হবে। প্রয়োজনে আপনাদের স্বামীদেরও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আপনাদের গৃহের পরিবেশকেও এমন পবিত্র করতে হবে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ একটি পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

এভাবে প্রত্যেক আহমদী পরিবার যদি একটি নেক ও পবিত্র সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে যায় তাহলে যে শিশুর জন্ম হবে, যে সন্তান বড় হবে, তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই, নিজের পদমর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হোন, কোনো আহমদী নারী সমাজের সাধারণ নারীর মত নয়, আপনারা হচ্ছেন সেই নারী যাদের সম্পর্কে খোদার রসূল সুসংবাদ দিয়েছেন **'তোমাদের পদতলেই জান্নাত'**। আর এমন কোন্ মা আছে যে তার সন্তান ইহ ও পারলৌকিক জান্নাতের উত্তরাধিকারী হোক তা চায় না? কাজেই নব উদ্যম, দোয়া ও সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিজেদের সন্তানদের তরবীয়তের প্রতি মনোযোগ দিন। আপনারা সৌভাগ্যবতী! কেননা খোদার পবিত্র রসূল এবং মসীহ্ (আ.)-এর দোয়া আপনাদের সঙ্গে আছে।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সাহায্য করো আর আমাদের বংশধরদের ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। আপনারা সবাই নিজ নিজ সন্তানদের সঠিক তরবীয়ত করবেন এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হবেন এটিই আল্লাহ্‌র কাছে আমার দোয়া। আসুন এখন আমরা দোয়া করি।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

To Watch Friday Sermon Regularly

Pleace visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক- “রাব্বুল আলামীন”

মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

‘আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন’ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত আমাদের সকলের জন্য ফরজ। ইবাদতের জন্য আল্লাহ্ সম্পর্কে জানা দরকার। তাই আজ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

প্রথমেই এতটুকু বলা আবশ্যক বলে মনে করছি, যা কিছু বলব, এ কথা গুলো আমার নয়, বক্তব্য আমার নয়, হযরত মসীহ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর লেখা তফসীর সূরা ফাতেহা থেকে সংগ্রহ করেছি। আমার হয়ত ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু পুরোপুরি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর লেখা থেকে সংগ্রহ ।

একথাও বলা প্রয়োজন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর তফসীরও হযরত মসীহ মাওউদ (আ) এর নিজের রচনা নয়, হুযূর (আ.) এর গবেষনা লব্ধ নয়। আল্লাহ্ তা’লা হুযুর (আ.) কে যে ঐশী পবিত্র-জ্ঞান দিয়েছেন- তিনি তা বর্ণনা করেছেন।

আপনারা জানেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কোন মাদ্রাসায় পড়া মৌলভী বা মওলানা সাহেব নন। ঐ যুগের সম্ভ্রান্ত বনেদী মুসলমান পরিবারের অভিবাবক গণ তাদের নিজ গৃহে গৃহ- শিক্ষক রেখে কুরআন মজিদ, প্রাথমিক কিছু আরবী ফার্সী পড়িয়ে দিতেন।

হযরত (আ.) কেও সেরকম প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। বাকী ঘটনা আপনারা জানেন, হযরত (আ.) রাত দিন কুরআন পড়তেন, হাদীস পড়তেন, দরূদ পড়তেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সমস্ত ধর্মীয় জ্ঞান আল্লাহ্ প্রদত্ত।

বিশেষ করে সূরা ফাতেহার তফসীর ইতিপূর্বে কোন দিন কোন আলেম লিখেননি। বহু তফসীর আছে। আপনারা পড়ে দেখুন। সেখানে মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বেশী কেউ লিখতে পারেননি। পারবেনই বা কেন? ইঞ্জিলে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, সূরা ফাতেহার তফসীর শেষ যুগে মসীহ মাউদ (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রকাশ করা হবে। (দেখুন:ইঞ্জিল,মুকাশেফাত বাব ১০, আয়াত ২)

অতএব হযরত (আ.) সম্পূর্ণ ঐশী বা আল্লাহ্ তা’লা প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে সূরা ফাতেহার তফসীর লিখেছেন এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে লিখেছেন যে এমন তফসীর অন্য কেউ লিখতে পারবে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সেই তফসীর থেকে “বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক রাব্বুল আলামীন” সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সূরা ফাতেহা কুরআন মজিদের সারাংশ এবং এখানে আল্লাহ্‌র চার সিফাতের উল্লেখ করা হয়েছে : রাব্বুল আলামীন, রহমান, রহীম, মালেকে ইয়াওমিদ্দীন। এই চারটিই আল্লাহ্‌র বুনিয়াদী বা মৌলিক সিফাত। সিফাত অর্থ আল্লাহ্‌র গুণাবলী। এ সিফাতগুলো তাঁর সৃষ্টির মাঝে সর্বক্ষণ বিরাজমান বা ক্রিয়াশীল।

আল্লাহ্ তা’লার আসল নাম আল্লাহ্। বাকী সমস্ত নাম তাঁর গুণবাচক নাম। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে.....লাহুল আসমাউল হুসনা। সমস্ত ভালগুণ কল্যাণকর, মঙ্গলময় গুণাবলী আল্লাহ্‌র।

আল্লাহ্‌র মাঝে কোন ত্রুটি বা অশুভ বা সল্পতা বা তার কোন কলঙ্ক নাই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি কখনো কারো থেকে দূরে নন; আবার কারো কাছে নন। ‘লা তাখুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নওম’ তিনি কখনো ঘুম বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৫৬)

এবার রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে বলছি।

আলহামদুলিল্লাহিরাব্বিল আলামীন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কুরআন মজিদ ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত সঠিক সত্য তথ্য দিতে পারেনি। এখানে আরম্ভে আলহামদুলিল্লাহ। প্রকৃত অর্থেই

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যত গবেষনা করবেন, যত জ্ঞান অর্জন করবেন, যত বেশী অনুসন্ধান করবেন- বারবার একথাই প্রমানিত হবে যে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রাব্বুল আলামীন। সঠিক তৌহিদও কোথাও নাই। কেবল মাত্র কুরআন মজিদ থেকে একজন মানুষ খাঁটি তৌহিদ কে জানতে পারবে।

আরবী ভাষার বড় বড় অভিধান অনুসারে রাব্ব শব্দ অর্থ বর্ণিত হয়েছে: (১) মালিক-সর্বাধিপতি (২) সৈয়্যদ-নেতা (৩) মুদাব্বির-পরিকল্পনাকারী (৪) মুরুব্বি (৫) কায়েম-সুপ্রতিষ্ঠিত (৬) মুনয়েম-পুরস্কার দাতা (৭) মুতাম্মিম-পরিপূর্ণতা দানকারী।

মালিক অর্থ সর্বাধিপতি- সবকিছুর সম্পূর্ণ মালিকানা আল্লাহ্‌র, সবকিছুর ওপর তাঁর সার্বক্ষনিক একচ্ছত্র আধিপত্য বা পূর্ণ নিয়ন্ত্রন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত কারোর ওপর অন্য কারো অধিকার নাই। অনেকে একথা বিশ্বাস করে না, আপনাদের অদ্ভুত মনে হলেও এটি চূড়ান্ত সত্য, এটি বুঝতে পারলে আমরা নিরাপদ, আমরা সফল।

রাব্বুল আলামীন এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তিনিই স্রষ্টা। আকাশ সমূহ বা পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর সৃষ্টি। (সূরা আনাম:১৬৫)

এখানে একটু বলে রাখি, একথাগুলো ইতিপূর্বেও এখানে বলেছি- তবুও আবার বলতে হয়। বিশ্বজগত কি? কত বড়? আমাদের পৃথিবী একটি সৌর জগতের একটি গ্রহ মাত্র। আমাদের কেন্দ্র সূর্য। সূর্য ও তার ৮টি গ্রহ, চাঁদ ইত্যাদি মিলে একটি সৌরজগত। এমন কোটি কোটি সূর্য ও সৌরজগত মিলে একটি গ্যালাক্সি। এমন কত লক্ষ বা কত কোটি গ্যালাক্সি আছে, তা জানা নেই। তারপর বলা হয়েছে, এসব গ্যালাক্সি সম্প্রসারিত হচ্ছে-

"এবং আমরা নিজহাতে এই আকাশকে সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চয় আমরা মহা সম্প্রসারণকারী। সবই সম্প্রসারিত হচ্ছে।" (সূরা যারিয়াত; আয়াত ৪৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছেন গ্যালাক্সিগুলো একদিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং একদিকে সরে যাচ্ছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, কোন অজানা জগত রয়েছে, যার আকর্ষণে আমাদের এই বিশ্বজগত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি আল্লাহ্‌র মহাশক্তির বিকাশ। রাব্বুল আলামীন, যিনি এ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ন্ত্রনকারী। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নাই...

সুতরাং তুমি বারবার দৃষ্টি ফেরাও, তুমি সৃষ্টির মাঝে কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। (সূরা মুলক:৪)

অর্থাৎ বিশ্বজগতের কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা দেখতে পাবে না। রাব্বুল আলামীন লালন পালন করেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

রাব্বুল আলামীন এমন একটি পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ কালাম (বাণী), যদি নভোমন্ডলে আরো গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কার হয়, তাহলে সে গুলোও রাব্বুল আলামীনের অন্তর্ভুক্ত হবে। হুযূর (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ ব্যতিত কোন কিছু নাই, যার সৃষ্টিকর্তা এবং লালনকর্তা রাব্বুল আলামীন ব্যতিত কেউ হতে পারে। তাঁর রাবুবিয়্যত বা তাঁর লালন-পালনের পরিধির বাইরে কিছু নাই, সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর রাবুবিয়্যত বা তরবিয়্যতের মধ্যে। রাব্ব্ অর্থ- লালন-পালনকারী এবং আমরা এটিকে তরবিয়্যত করা বলি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পরিষ্কার জানিয়েছেন, সূর্য বা গ্রহ-নক্ষত্র এগুলো নিজেরা কিছুই না। এসবের পেছনে আল্লাহ্‌র মহাশক্তি কার্য্যকর বা ক্রিয়াশীল। তিনি রাতের বেলা চাঁদকে আলোকিত করছেন। দিনের বেলা সূর্যের আলোর সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে ফসল এবং গাছপালাকে সজীব-সতেজ করছেন। ফলফলাদি বা ফসল ফলাচ্ছেন। সৃষ্টির সবকিছু পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, পশু-পাখির জীবন বাঁচাচ্ছেন । আমাদের সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় জ্যোতিষ্ক রয়েছে। কোন কোন নক্ষত্র এত দুরে যে, এখনো তার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছেনি। কিন্তু যখনই তিনি ইচ্ছা করেন, তখন একটি নক্ষত্র ধ্বংশ হয়ে যায়। আবার তিনি যখন চান, তখন অপর একটি নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি হয়ে যায়। সৃষ্টির সব ক্ষেত্রে এই ভাঙা-গড়া চলছে। আমাদের পৃথিবী একদিন ছিল না, আবার একদিন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

পৃথিবীকে তিনি জীবন্ত ও চলন্ত রেখেছেন। বৃষ্টি হয়, ফল-ফসল, ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, আবার খরা হয়, তখন সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই সব কিছু তাঁরই ইচ্ছামত হচ্ছে। এতে অন্য কারো কোন প্রকার হস্তক্ষেপ নাই। হস্তক্ষেপের ক্ষমতা রাখে এমন কেউ নাই।

সমগ্র সৃষ্টির মাঝে রাব্বুল আলামীন, রহমান, রহিম ও মালিকি ইয়াওমিদ্দীনের তাজাল্লী বা বিকাশ ঘটছে সর্বক্ষণ। এজন্য সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য।

রাব্ব্ এর একটি প্রধান অর্থ কোন কিছুকে তার সৃষ্টির সময় থেকে আস্তে আস্তে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং পূর্ণতা দান করা। একটি মানব-শিশু মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহন করে। প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ ভ্রুণ থেকে পূর্ণতা পেয়ে একটি শিশু ভূমিষ্ট হয়। তারপর শিশু বড় হতে থাকে। আস্তে আস্তে সাবালক হয়, তারপর পূর্ণ মানব হয়। তারপর সে বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়, শেষে মৃত্যু বরণ করে। অনুরূপ ভাবে সৃষ্টির সবকিছু। সুতরাং সৃষ্টির আরম্ভ থেকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং পূর্ণতা দান করা রাব্বুল আলামীনের কাজ। অতএব আমাদের উচিত তাঁর ইবাদত করা। ইবাদত করাতে আমাদের মঙ্গল। না করাতে তাঁর কোন সমস্যা নাই। তিনি তো আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। সৃষ্টির সকল কিছু তার তসবিহ তাহমিদ করছে। অসংখ্য মানুষ অবশ্যই তাঁর প্রশংসা বা তসবিহ তাহমিদ করছে। যদি কিছু লোক না করে, তাহলে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রাব্বুল আলামীনের রাবুবিয়্যাত সৃষ্টির সবার ক্ষেত্রে এবং এটি অতি সুন্দর সুব্যবস্থা। এর চেয়ে উত্তম কিছু কেউ চিন্তা করতে পারে না। তিনি সকল স্থানের বা অঞ্চলের রাব্ব, তিনি সকল যুগের রাব্ব। সকল কল্যাণ ধারা তাঁরই থেকে উৎসারিত হচ্ছে। তিনিই সকল প্রকারের শারিরীক ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। যত প্রকার শরীর বা অস্তিত্ব আছে, তাঁরই কল্যাণে লালিত হচ্ছে। সকল অস্তিত্ব তাঁরই সাহায্যে বা আশ্রয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করছে। তাঁর আশ্রয়ের বা আওতার বাইরে যে যাবে, সে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সকল দেশের সকল জাতির সকল

যুগের মালিক তিনি । কেউ বলতে পারবে না যে সে রাব্বুল আলামীনের সাহায্য কম পাচ্ছে। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষি এবং তিনি সবাইকে যার যা প্রয়োজন তা সবই দিচ্ছেন। এ সিফতের প্রতিফলন সবার জন্য নির্বিচারে সমান। এজন্যই সকল জাতির মানুষের মধ্যে এলহাম এবং মোজেযা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এজন্যই বলা হয়েছে-

"এমন কোন মানব জাতি বা মানবগোষ্ঠি নাই, যাদের মাঝে নবী আসেনি।"

(সূরা ফাতের:২৫)

এতক্ষণ আমি 'রাব্বুল আলামীন'-জগত সমূহের প্রভু প্রতিপালক সম্পর্কে বললাম। তিনি সব কিছুকে জীবন দান করেন, জীবিত রাখেন এবং সব কিছুর রাবুবিয়্যাত বা তরবিয়ত করেন অর্থাৎ তাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যান এবং পরিপূর্ণতা দান করেন, যেন সে সুন্দর ভাবে, সফল ভাবে, জীবন যাপন করতে পারে। এটি হোল জাগতিক ভাবে, শারীরিক ভাবে পরিপক্বতা ও পূর্ণতা দান করা, প্রত্যেকে যেন সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে।

তারপরের বিষয় মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দেয়া। এটা হতে পারে না যে তিনি কেবল শারীরিক শক্তি দিয়ে জাগতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা করবেন না। কারণ মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। একটু চিন্তা করুন, মানুষ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি না করে, তাহলে সে মানুষ হয় না। মানুষ তো সে, যার মধ্যে মানবীয় গুনাবলী, চারিত্রিক গুনাবলী রয়েছে। জীব-জন্তু ও মানুষের মধ্যে এটাই পার্থক্য যে, মানুষের মাঝে চারিত্রিক গুনাবলী থাকবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম ধাপ চারিত্রিক গুনাবলী। যেমন মানুষ মানুষকে ভালবাসে। পশুরা এমন নয়।

সুতরাং রাব্বুল আলামীন আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা করেছেন। যুগে যুগে নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমে মানব-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যেমন হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, উলঙ্গ থাকবে না। ঘর বাঁধবে। বিয়ে করবে। রান্না করে খাবে। এর পূর্বে মানুষ অন্য জন্তুর মতই ছিল। এখান থেকে মানব-সভ্যতার আরম্ভ। স্মরণ রাখা দরকার যে, মানুষের চারিত্রিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি আধ্যাত্মিক ইমামের হাতে তথা নবী-রসুলের হাতে হয়ে থাকে। রাষ্ট্র বা জাতির উন্নতি জাগতিক উন্নতি, যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এর উন্নতি রাষ্ট্রনায়কের দ্বারা হতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক-উন্নতি আধ্যাত্মিক ইমামের হাতেই হতে পারে।

এখন জানা দরকার 'আলামীন' অর্থ কি? 'আলামীন' আলমের বহু বচন। একটি আলম আর বহু আলম। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, আলম শব্দটি বিভিন্ন জাতিসমূহের জন্য, বিভিন্ন যুগের জন্য এবং বিভিন্ন দেশের জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ রাব্বুল আলামীন সকল জাতি, সকল গোষ্ঠী সমূহের জন্য ব্যবহার হয়েছে। নতুবা অভিযোগ থাকত-; কোন জাতি বা গোষ্ঠী বলত সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রতি সুনজর দেননি, সুবিচার করেননি। অতএব, সকল যুগে, সকল দেশের সকল জাতির জন্য তিনি রাব্বুল আলামীন। কখনো কোন কালে, কোন যুগে কোন জনগোষ্ঠী তার তরবিয়তের বাইরে ছিল না। আদম (আ.) এর যুগে বা নূহ (আ.) এর যুগ বা ফেরাউনের যুগ। ফেরাউনের জাতিরও তিনি রাব্ব, হযরত মুসা (আ.) এর জাতিরও তিনি রাব্ব। তিনি আফ্রিকানদেরও রাব্ব। চীনাদেরও রাব্ব।

আলম শব্দ মুলতঃ ব্যবহার হবে এমন কিছুর জন্য, যার সম্পর্কে খবর হতে পারে, যার সম্পর্কে জানা যাবে, যার অস্তিত্ব আছে এবং যে একজন মহা শক্তিশালী, পরিকল্পনাকারী রাব্ব সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবে, সে আলম। যাকে দেখলে জানা যাবে যে, আল্লাহ্ আছেন, আমরা একে জগত বলি। সৌরজগত, প্রাণীজগত, উদ্ভিদজগত এমন অনেক জগত আছে। এরা প্রমাণ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আছেন।

আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে তাঁরই প্রশংসার গীত গাওয়া হচ্ছে- আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। হামদ বা প্রশংসাকারীরা সারাক্ষণ তাঁর প্রশংসায় ব্যস্ত। প্রত্যেকে তাঁর প্রশংসারত। যে ব্যক্তি তাঁর প্রশংসায় ডুবে যায়, তাঁর ইবাদতে নিজেকে নি:শেষ করে দেয়, নিজেকে তাঁর মধ্যে বিলীন করে, তাঁর রঙে রঙীন হয়ে যায়, তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে যায়, সে আলম হয়ে যায়। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে কুরআন মজিদে উম্মত বলা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ আলম বা জগত। কারণ তিনি সর্বক্ষণ যা করেছেন তা সবই আল্লাহ্‌র ইবাদতের পর্যায়ে পড়ে। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ্‌র মাঝে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব, সমগ্র বিশ্বজগত যেমন আলামীন, তেমনই তিনিও আলম এবং তিনি ও তাঁর জামা'ত নিয়ে একটি পরিপূর্ণ আলম। কারণ তাঁর দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আলামীনের মধ্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহিমা বিকশিত হচ্ছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও আল্লাহ্‌র মহিমার বিকাশ ঘটেছে, তাই হুযুর (সা.) ও তাঁর জামা'ত একটি আলম বা একটি জগত। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মাউদ (আ.) ও তাঁর জামা'ত একটি আলম, একটি জগত।

পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীও আলম বা জগত। অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর জামা'ত একটি আলম। হযরত মসীহ মাউদ (আ.) ও তাঁর জামা'ত একটি আলম। অর্থাৎ এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহিমার বিকাশ ঘটেছে। এদের দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের মাঝে প্রধান চার সিফাত রাব্বুল আলামীন, রহমান, রহীম ও মালেকে ইয়াওমেদ্দীনের বিকাশ ঘটেছে, যেমন বিশ্ব-জগত সমূহের মাধ্যমে তাঁর এই চার সিফাতের বিকাশ ঘটেছে। গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে এর মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রমাণ পাওয়া যাবে । বিশ্ব জগতের সবকিছু আল্লাহ্‌র প্রশংসায় রত, আল্লাহ্‌র মহিমা রত।

এই মৌলিক চার সিফাতের বিকাশ কিভাবে ঘটে বা আঁ হযরত (সা.) ও তাঁর জামা'তের মাঝে ঘটেছে, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য বহু ঘন্টা সময় দরকার। আমি অতি সংক্ষেপে ১-২ টি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছি।

মাতৃগর্ভে একটি ভ্রুণ থেকে একটি শিশুর জন্ম হয়। তখন সে বড় অসহায় হয়। রাব্বুল আলামীন তাকে ৩০/৪০ বছর পর বিরাট শক্তিশালী মানবে পরিণত করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুকালে এতীম

অসহায় ছিলেন। তারপর আল্লাহ্‌র তৌহিদ প্রচারের কারণে মক্কাবাসী তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় অবস্থান নিলেন। এর নয় বছর পর মক্কা বিজয় করলেন। কাবা গৃহে ৩৬০ প্রতিমা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তৌহিদের বিজয় হোল এবং হুযুর (সা.) আরবের সম্রাট হয়ে গেলেন। এর মাধ্যমে মৌলিক চার সিফাতের বিকাশ ঘটল।

আজ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মুহাম্মদ (সা.) এর গোলাম কাদিয়ানে একা ছিলেন। অসহায় ছিলেন। ১৮৯০ সনে তৌহিদের পতাকা উড়ালেন। বললেন ঈসা (আ.) মারা গেছেন। আমিই মুহাম্মদী ঈসা। সকল মুসলমান আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন। হিন্দু-খ্রিষ্টান সবাই চরম বিরোধিতা করতে থাকল। কিন্তু কুরআন হাতে নিয়ে কুরআনের মহিমা বর্ণনা করে করে আজ সারা বিশ্বে তৌহিদের ঝান্ডা গাড়লেন। আজ বিশ্বের ২০৪টি দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর একমাত্র অস্ত্র ছিল কুরআনের জ্ঞান, দোয়া এবং ঐশী নিদর্শন বা মোজেযা। তাঁর আগমন এজন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে মুসলমান হিন্দু, খ্রিষ্টান, সবাই মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছে, চালাচ্ছে। বলা হয়েছে, বলা হচ্ছে । হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তারপর সাহাবায়ে কেরাম তরবারির জোরে জয়ী হয়েছিলেন। জঘন্য এই অপবাদকে দূর করার জন্য এবার হযরত মসীহ মাউদ (আ.) কুরআন বা কুরআনের আলো- আর দোয়া ও মোজেযা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এবং তরবারি ছাড়া কেবল কুরআনের আলো দিয়ে দোয়া ও মোজেযার সাহায্য জয়যুক্ত হয়েছেন।

এতে করে কি আল্লাহ্‌র মহাশক্তির বিকাশ ঘটেনি? এমনি এমনি এত বড় ঘটনা ঘটে গেল? হযরত মসীহ মাউদ (আ.) বলেছেন, কুরআনে ঘোষনা করা হয়েছিল 'লাহুল হামদো ফিল উলা ওয়াফিল আখেরা'....(সূরা কাসাস:৭১)

রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র কামেল ও পূর্ণমাত্রার প্রশংসা প্রথম যুগে হযরত মুহাম্মদ এর দ্বারা প্রমাণিত হবার কথা ছিল এবং শেষ যুগে তাঁর (সা.) গোলাম হযরত আহমদ (আ.) এর যুগে আবার এমন হবার কথা ছিল। এটি আল্লাহ্‌র তকদীর- কেউ খন্ডাতে পারে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই তফসীরে বলেছেন, প্রচন্ড খরা দেখা দিলে ভূপৃষ্ঠের জল-স্থল শুকে যায়, ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তারপর বৃষ্টি নামে- আবার ভূপৃষ্ঠে জীবন দেখা দেয়। ফসল উৎপাদন হয়- এটি রাব্বুল আলামীনের মহিমা। অনুরূপভাবে রুহানী জগতে গুমরাহী চরম আকার ধারন করলে রুহানী বৃষ্টি নাযেল হয়। সকল নবীগণ এমনই রুহানী বা আধ্যাত্মিক গুমরাহি বা অনাবৃষ্টির পর আধ্যাত্মিক বৃষ্টি নিয়ে এসেছেন। কারণ তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, সৃষ্টিজগতের লালন-পালন কর্তা। এভাবে প্রমাণ হয়েছে-

শেষে আবারো বলি, রাব্ব অর্থ যিনি প্রত্যেককে জন্ম থেকে তরবিয়্যত দিয়ে লালন করে তাকে পূর্ণতা পর্যন্ত নিয়ে যান এবং পরিপূর্ণ সাফল্য দান করেন। এটি প্রত্যেক এককের ক্ষেত্রে এবং জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সবশেষে আবার বলব আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

● কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

● মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

● পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

● ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৩)

৩। অস্ত্রের জোরে ইসলাম প্রচারিত হয় নাই

নিরপেক্ষভাবে বিচার–বিশ্লেষণ করে অনেক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং ঐতিহাসিক এ কথা স্বীকার করেছেন যে ইসলাম অস্ত্রের জোরে প্রচারিত হয় নাই। এই বিষয়ে কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করার আগে ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা এবং সৌন্দর্যের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক।

পবিত্র কুরআনের আলোকে শান্তিবাদী ইসলামী-শিক্ষা ও সৌন্দর্য

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়েছেন বিশ্বের রহমত (কল্যাণ) হিসেবে (২১:১০৮)।

এই ঘোষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের নবী কখনই অকল্যানজনক কোন কথা বা কাজ করতে পারেন না অথবা তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে কখনই ঐরূপ নির্দেশ দিতে পারেন না। ফলত: ধর্ম–প্রচারের জন্য তরবারির ব্যবহারের প্রশ্নই উঠে না।

সুরা বাকারা : ২৫৭ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছেন যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর– জবরদস্তী তথা বল–প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সঙ্গে এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে এই যুক্তিও দেওয়া হয়েছে যে, সত্য সকল প্রকার মিথ্যা এবং বিভ্রান্তি হতে সুস্পষ্টরূপে পৃথকভাবে বিরাজমান। "কেউ কোন ব্যক্তিকে–কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরেকে–হত্যা করলে, সে সমগ্র মানবমন্ডলীকে হত্যা করল, যে কেউ একটি জীবনকে বাঁচাল, সে যেন সমগ্র মানবমন্ডলীকে বাঁচাল।" (আল মায়েদা: ৩৩১)। পবিত্র কুরআনে সুরা মায়েদা : ৪ আয়াতে ধর্মীয় বিধি–নিষেধ সংক্রান্ত ঐশী বিধানের পরিপূর্ণতার নীতিমালা এবং আইন–কানুন, যা মানুষের দৈহিক,নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়, তা পরিপূর্ণভাবে বিবৃত করা হয়েছে। সুরা শুরা : ৪৯ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেনঃ"যদি অবিশ্বাসীরা বিমুখ হয়ে যায়, তবে আমরা তোমাকে তাদের ওপর হিফাজতকারী করে পাঠাই নাই। কেবল সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়াই তোমার কর্তব্য।" সুরা তওবা : ১০০ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন, তবে ভূ–পৃষ্ঠের যত লোক আছে, তারা সকলে ঈমান আনতো। সুতরাং তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিশ্বাসী হয়?" সুরা নহল: ১২৬ আয়াতে হিকমত এবং সদুপদেশ দ্বারা স্রষ্টার পথে লোকদিগকে আহবান জানানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সুরা আনফাল:৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ধ্বংস হয়, যে দলীল–প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং সেই ব্যক্তি জীবিত হয়, যে দলীল–প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে। সুরা হুজুরাত: ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে:"নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ব–বিদিত।"

হাদীসের আলোকে ইসলামের শান্তিবাদী শিক্ষা ও সৌন্দর্য

এই বিষয়ে অনেকগুলো হাদীসের মধ্য থেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি যথেষ্ট হবে ঃ "তোমরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কাজ করবে না, আশার বানী শুনাবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে বীতশ্রদ্ধ করবে না এবং ঐক্যমত সহকারে কাজ করবে, মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।" (বুখারী)। "আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কয়েকটি বিষয় ভালবাসেন : (১) তিনি পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছু বা কাকেও শরীক করো না, (২) সকলেই তাঁর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। ঐক্য এবং একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করো এবং বিবাদ সৃষ্টি করো না, দলাদলি করো না এবং (৩) তিনি পসন্দ করেন না বাদ–প্রতিবাদ করা, কলহ ও বাড়াবাড়ি এবং অপব্যয় করা।"(মুসলিম)। বিদায়–হজ্জের ভাষণে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)–ঘোষনা করেছেন :"সব মানুষ, তা তারা যে কোন জাতিরই

হোক আর যে ধর্মেরই হোক, মানুষ হওয়ার কারণে তারা পরস্পর সমান"(সহীহ হাদীস)।

৬২২ খৃষ্টাব্দে রচিত মদীনা সনদের ৪৭টি ধারা ছিল, যেগুলো পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান (The First Written Constitution) হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত (ইবনে হিসাম : 'সীরা গ্রন্থানুসারে)। এই সকল ধারার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঐক্য, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও যুদ্ধাবস্থার অবসানের উদ্দেশ্যে এই সনদ প্রণীত হয়। মদিনা সনদের মাধ্যমে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করেছেন মদীনায় বসবাসরত পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে। এই সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় যুদ্ধ ও যুদ্ধ-লিপ্সা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এই সনদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ, যেমন প্রফেসর পি,কে, হিট্টি এই সনদের ভূয়শী প্রশংসা করত: বলেছেনঃ The Charter of Medina was the first attempt in the History of Arabia of a social organization with religion than blood as its basis"(History of the Arabs, P-120)। ফলত: ইসলামী শিক্ষা ও সমাজ নীতি কখনই তরবারি বা রক্তপাতের ভিত্তিতে সূচীত বা রচিত হয় নাই।

অমুসলিম চিন্তাবিদ ও জ্ঞানী-গুণীজনের অভিমতের আলোকে

ইসলাম তলোয়ার দ্বারা প্রচারিত হয় নাই- এই বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত অমুসলিম চিন্তাবিদ এবং জ্ঞানী-গুণী জনের লেখার আলোকে উপস্থাপন করা হলো।

(ক) পন্ডিত জ্ঞানেন্দ্র দেব শর্মা বলেছেনঃ

"ইসলামের প্রায় সকল বিরুদ্ধবাদী, বিশেষতঃ বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী প্রচারকগণ এবং দেশে অশান্তির অনল প্রজ্জালনকারী দল বলিয়া থাকে যে, হযরত মোহাম্মদ সাহেব (সা.) মদীনা যাইয়া শক্তি সঞ্চয় পূর্বক দয়া ও সৌজন্য সূচক তাঁহার কৃত্রিম শিক্ষায় অটল থাকিতে পারেন নাই। বরং তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসার আসক্তি, রাষ্ট্র-ক্ষমতা, পদবী, ধনদৌলত প্রভৃতি লাভের প্রবল পরাক্রমের সহিত তিনি তরবারি ও শক্তি প্রয়োগ করেন। বরং এইরূপ পর্যন্ত তারা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই যে, তিনি খুনী পয়গারম্বররূপে পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া-কান্ডের একশেষ করিলেন এবং তিনি তাঁহার কৃত্রিম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মানদণ্ড হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু ইহা ঐ সকল সংকীর্ণ-চেতা বিরুদ্ধবাদীগণের অভিমত, যাহারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অযথা বিদ্বেষ পোষণ করে। উপযুক্ত দৃষ্টি-শক্তির অভাব বশতঃ ও পক্ষপাতিত্বরূপী অজ্ঞানতার পর্দা তাঁহাদের চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখার কারণে তাঁহারা আলোর পরিবর্তে আঁধারের, গুণের পরিবর্তে দোষের, ভালোর পরিবর্তে মন্দেরই অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং যাবতীয় উচ্চ মার্গ ও শিক্ষাকে এমনই বিশ্রীভাবে উপস্থিত করেন যে, তাহাতে তাঁহাদের কুৎসিত অভ্যন্তরিণ অবস্থা ও তাঁহাদের চিত্তে-কালিমার সন্ধান পরিস্কারভাবে পাওয়া যায়।" (দুনিয়া কা হাদীয়ে আযম গাইরো কি নজর-মেঁ মকবুল'পৃ-৫৭) এই উদ্ধৃতিটি এক অমুসলমান বক্তা পন্ডিত জ্ঞানেন্দ্র দেব শর্মা শাস্ত্রীর একটি বক্তৃতা হইতে গৃহীত। তিনি ১৯২৮সনে গোরক্ষপুরে হযরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতাদানকালে উক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। পরে পন্ডিত মহাশয় এই বক্তৃতাতেই ইসলামের মীমাংসাকারী শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার সারমর্ম বর্ণনা করেনঃ ***"বিরুদ্ধবাদীগণ অন্ধ। তাহারা দেখিতে পায় না যে, মোহাম্মদ (সা.) এর দয়া ও সৌজন্য, বন্ধুত্ব ও ক্ষমাই ছিল তাঁহার তরবারী, যাহা বিরুদ্ধাচারীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিত। ইহা তাহাদের হৃদয়কে পরিষ্কৃত করিয়া আয়নার ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া দিত। লৌহ নির্মিত তরবারি অপেক্ষা ইহার কাটিবার ক্ষমতা ভয়ংঙ্কর এবং ইহা অতীব ধারাল।" (দুনিয়া কা হাদীয়ে আজম গাইরো কি নজর মেঁ মকবুল , ৬১ পৃঃ)।***

(খ) সম্পাদক-'সৎ-উপদেশ': পত্রিকা

"লোকে বলে, ইসলাম তরবারির বলে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাদের এই অভিমতের সহিত একমত হইতে পারি না, কারণ বলপূর্বক যাহা বিস্তার করা হয়, শীঘ্রই অত্যাচারীর নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লওয়া হয়। (দুঃখের বিষয় মৌলানা মৌদুদী সাহবের নবুয়তের প্রকৃতির সহিত পরিচিত চক্ষু'র সম্মুখে এই স্থুল কথাটিও ধরা পড়ে নাই! উদ্বৃতি দাতা)। ইসলামের প্রচার অত্যাচার-মূলক হইয়া থাকিলে, আজ ইসলামের নাম-গন্ধও থাকিত না। কিন্তু ইহার পরিবর্তে আমরা দেখিতে পাই যে, ইসলাম ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। মানুষ মাত্রের জন্যই তাঁহার প্রেম ছিল। তাঁহার মধ্যে প্রেম ও দয়ার পবিত্র বৃত্তিগুলি কাজ করিতেছিল। সৎ-চিন্তা তাঁহার পথ প্রদর্শক ছিল।" (লাহোর ৭ই জুলাই, ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ বরগুযিদা রসূল গয়রু মেঁ মকবুল',১২-১৩ পৃঃ) !

(গ) 'আর্য মুসাফের পত্রিকা: "যে মহাপুরুষ কোরেশগণকে জলন্ত ইমানের পাত্র থেকে পান করাইয়াছিলেন, তিনি এক মুর্তিমান মুজেযা ছিলেন--- যদি মোহাম্মাদের জীবন একটা মুজেযা না হইত, তবে কে আমাদিগকে অলিদের (যথাসম্ভব 'খালিদ-বিন্ অলীদকে' লেখক বুঝাইতেছেন -উদ্ধিতি দাতা) নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা অনুপ্রাণিত করিত? হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-উদ্ধৃতিদাতা) ঈমানের সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়াছেন এবং আরবের মরু-বাসীগণকে এক ওয়াহেদ খোদার উপাস্যে পরিণত করিয়াছেন।" (অক্টোবর ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ, ১ম,২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা 'বরগুযিদা রসুল গায়রু মেঁ মকবুল,' ২৪ পৃঃ)।

(ঘ) লাহোরে অনুষ্ঠিত আর্য-সমাজের এক অধিবেশনে গুরুকুল নগরীর বৈদিক কলেজের প্রাক্তন প্রফেসর এবং বৈদিক ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক প্রফেসর রামদেব মহাশয় আমাদের প্রভু মোহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে তরবারির দ্বারা ইসলাম প্রচার করিবার অপবাদটি ভ্রান্ত নির্ধারণ পূর্বক তাঁহার গবেষণার ফল বর্ণনা করেনঃ "কিন্তু মদিনায় বসিয়া থাকিয়া মোহাম্মদ সাহেব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-উদ্ধৃতি-দাতা) তাহাদের মধ্যে যাদুর বিদ্যুৎ ভরিয়া দিলেন।

এমন এক বিদ্যুৎ, যাহা মানুষকে দেবতায় পরিণত করে----***ইসলাম শুধু তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহা ভ্রান্ত কথা। বস্তুতঃ ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইসলাম বিস্তারের জন্য কখনও তরবারি ধারণ করা হয় নাই। ধর্ম যদি তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আজ কেহ বিস্তার করিয়া দেখাইয়া দিক।"*** (আখবার "প্রকাশ"–বহাওয়ালা বরগুজিদা গাইরু মেঁ মকবুল,২৪ পৃঃ)।

(ঙ) মোসিয়ু আওজিন ক্লোফল লিখেছেনঃ "মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম–উদ্ধৃতি–দাতা) সমগ্র বিশ্ব জয় করিতে ও ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা অত্যাচার করেন নাই। তাহাদিগকে ধর্মমতের স্বাধীনতা দিয়েছেন, বিবেচনা-শক্তির স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাহাদের কৃষ্টি ও সামাজিক-অধিকার বজায় রাখিয়াছেন।"('ইসলাম আওর ওলামায়ে ফেরিঙ্গ', ৯ পৃঃ, 'বরগুজিদা রসুল গয়রুঁ মে মকবুল, ১১ পৃঃ)।

(চ) মি. গান্ধী অতিশয় সুক্ষ্ম–দর্শী ছিলেন। তিনিও তাহাঁর ইসলাম–বিরোধী মত পরিবর্তন করেন এবং 'ইয়ং ইন্ডিয়া' কাগজের এক সংখ্যায় স্বীকার করেনঃ "আমি যতই এই বিস্ময়কর ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি, এই সত্য আমার কাছে ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ইসলামের প্রাধান্য তরবারির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।"

(ছ) ডাঃ ডি, ডাবলিও লাইটজ কোরআন করীম হতেই এই অপবাদ খন্ডনার্থে এক অকাট্য দলিল দিয়েছেনঃ "বস্তুত: তাহাদের সকল যুক্তিই পন্ড হইয়া যায়, যাহারা মনে করে যে, জেহাদের উদ্দেশ্য ছিল তরবারির দ্বারা ইসলামের বিস্তার। কারণ ইহার বিরুদ্ধে সুরা হজ্বে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, জেহাদের উদ্দেশ্য মসজিদ,গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ও সাধু-সন্নাসীদের তপস্যালয়কে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা।" (এসিয়েটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ', অক্টোবর ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ)। [৪]

(জ) 'নাওয়াঁ হিন্দুস্থান' পত্রিকাঃ "প্রথমে যখন আঁ–হযরতের বিরুদ্ধাচারীগণ তাহার জীবন যাত্রাকে অসহনীয় করিয়া তুলিল, তখন তিনি তাঁহার অনুবর্তিগণকে জন্মস্থান ছাড়িয়া মদিনায় যাইতে বলিলেন। অর্থাৎ, দেশের কোন ভ্রাতার ওপর হাত তুলিবার পরিবর্তে হুজুর প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ পছন্দ করিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন তাঁহার প্রতি জুলুম সীমা ছাড়াইয়া গেল, তখন অগত্যা তিনি তাঁহার ও ইসলামের হেফাজতের জন্য তরবারি ধারণ করিলেন। ***ধর্ম প্রচারের জন্য বল প্রয়োগ করা যায় বলিয়া যে ঘোষণা করা হয়, উহা ঐ সকল নির্বোধ ব্যক্তিদের ধারণা, যাহারা না জানে ধর্ম, না জানে দুনিয়া। তাহারা প্রকৃত-সত্য হইতে দুরে বলিয়া এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা গৌরবানুভব করে।" (দিল্লী প্রকাশের তাং ১৭-১১-৬২খ্রীস্টাব্দ)।***

(ঝ) মিঃ ষ্ট্যানলী লেইনপুল মক্কা–বিজয় দিবস সম্পর্কে লিখেছেনঃ "এখন সময় ছিল, পয়গম্বর [সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম–উদ্ধৃতিদাতা] রক্ত–পিপাসু প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাঁহার চির উৎপীড়কগণ তাহার পদানত। এখন কি তিনি তাঁহার নির্দয় ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে পদদলিত করিবেন, ভীষণ দণ্ড বিধান করিবেন অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন? তখনই তাঁহার স্বীয় প্রকৃত রূপ ধারণ করিবার সময় ছিল। এখন আমরা এমন নিপীড়নের প্রতীক্ষা করিতে পারি, যাহা শুনিলে লোম–হর্ষণ হইবে। ইহার কথা ভাবিয়া যদি আমরা পুর্ব হইতেই ঘৃণা ও ভর্ৎসনাপূর্ণ চীৎকার আরম্ভ করি, তবে উহা আমাদের জন্য উচিৎ হইবে।

কিন্তু একি ব্যাপার! বাজারে কি কোন হত্যাকান্ড হয় নাই? সহস্র সহস্র নিহত ব্যক্তির মৃত–দেহগুলি কোথায়? ঘটনা সব সময় কঠোর ও নির্মম হইয়া থাকে। কাহাকেও রেহাই দেয় না। ইহা সত্য ঘটনা যে, যেদিন আঁ–হযরত [সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম–উদ্ধৃতি–দাতা] তাঁহার শত্রুদের ওপর জয়লাভ করিলেন, সেই দিনই তাঁহার নিজের আত্মার ওপর সর্বাপেক্ষা গৌরবময় বিজয় লাভ করিবার দিন ছিল। কোরাইশগণ বৎসরের পর বৎসরব্যাপী তাঁহাকে যে সকল দুঃখ–কষ্ট দিয়াছিল এবং নির্দয় অবমাননার বন্যা তাঁহার ওপর দিয়া বহাইয়াছিল, তিনি তাঁহার প্রশস্ত অন্তঃকরণে ঐ সবই উপেক্ষা করিলেন এবং সাধারণভাবে মক্কার সকল অধিবাসীর প্রতি এক সাধারণ ক্ষমাপত্র প্রদান করিলেন।"(কোরআন–চয়নিকা', ভূমিকা, ৬৭ পৃঃ)। [৩]

(ঞ) স্যার টমাস আর্নল্ড এবং ডি.এল ওলিয়ারী, ফ্রিতজফ সহুয়ন প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষাবিদ পান্ডিতগণ একবাক্যে লিখেছেন যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অস্ত্রের কোন সংশ্রব নাই এবং ন্যায়–বিচার এবং ক্ষমার আদর্শ তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

Sir Thomas W. Arnold, a well-known and highly respected orintalist, at one time Professor of Arabic in the University of London, made a thorough research into this question and in his outstanding work , *The Preaching of Islam,* first published in 1896, established beyond any doubt that the sword had nothing to do with the spread of Islam.

De L.O'Leary has affirmed æHistory makes it clear, however, that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most absurd myths that historians have ever repeated." (*Islam at the Crossroads,* p.8):

Frithjof Sohuon has observed Another reproach often leveled at him [Muhammad] is that of cruelty; but it is rather sternness that should be spoken of here, and it was directed, not at enemies as such, but only at traitors, whatever their origin---in the decisive phase of his earth mission, at the time of the taking of Mecca the messenger of Allah showed a superhuman gentleness in fact of a unanimous feeling to the contrary in his victorious army." (*Understanding Islam,*p.89):

(ট) S.P Scott এবং অন্যান্য প্রাচ্য–বিশারদগণ মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মানব-ইতিহাসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি– সর্ব প্রকার মাপকাঠির ভিত্তিতে। তাঁদের কিছু বক্তব্য নিম্নরূপঃ

ælf the object of religion be the inculcation of morals, the

diminution of evil, the promotion of human happiness, the expansion of the human intellect, if the performance of good works will avail in the great day when mankind shall be summoned to its final reckoning, it is neither irrevelent nor unreasonable to admit that Muhammad was indeed an Apostle of God" (S.P.Scott, *History of the Moorish Empire in Europe,* p.126).

পৃথিবীর মানচিত্রে সর্বকালের জন্য শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকারী হিসেবে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে একজন জার্মান এবং একজন ইংরেজ প্রাচ্য ভাষা বিশারদের পুস্তক থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি যথেষ্ট হবে বলে মনে করছিঃ

That Muhammad really lived cannot be disputed. The development of Islam, at least when compared with the other world religion –is open to the clear light of history , and presents us with yet another proof that the Prophetic personality is the original source of the new religious creation.------ Even today, after a period of development of thirteen centuries, one may clearly discern in genuine Islamic piety the uniqueness which is ultimately derived from its founder's personal experience of God." (Tor Andrae has recorded in his book *Muhammad: The Man and his Faith,* pp.১১-১২)।

W. Montgomery Watt, the well-known Orientalist has said: æThe more one reflects on the history of Muhammad and of early Islam, the more one is amazed at the vastness of his achievement.--- It is my hope that this study of his life may contribute to a fresh appraisal and appreciation of one of the greatest of the sons of Adam." (*Muhammad at Medina,* pp. 334-5): [৪]

এই সকল উদ্ধৃতি দ্বারাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রচার হয়েছে যুক্তি-জ্ঞান, শিক্ষা-আদর্শ এবং ঐশী-নিদর্শন দ্বারা। উন্মুক্ত হৃদয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করত: বিধর্মী চিন্তাবিদগণ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, ইসলাম অস্ত্রের দ্বারা প্রচার করা হয় নাই। পক্ষান্তরে কতিপয় মুসলিম নাম-ধারী মোল্লা শ্রেণীর পন্ডিত জিহাদ সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার করত: ধর্মের নামে রক্তপাতের কথা স্বীকার করেছেন কোন্ যুক্তিতে, তা ভাবতেও অবাক লাগে!

৪। 'কলমের জিহাদ'-এর আবশ্যকতা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে জিহাদ অস্বীকারের অপবাদ সন্দেহাতীতভাবে তাঁর শিক্ষা, নীতি, তাঁর সংগ্রামী ও মুজাহেদানা জীবন এবং তাঁর লেখা ও বক্তব্যসমূহের বিরোধী। তাঁর সমগ্র জীবন ইসলামের ওপর ঘোর সমালোচনামূলক আক্রমণসমূহের প্রতিরোধ, ইসলামের তবলীগ ও প্রচার এবং জিহাদে কবীর অর্থাৎ জিহাদ বিল-কুরআনের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তাঁর সময়কালে ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের ভয়াবহ চতর্মুখী আক্রমনের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে এক মহান জিহাদের কর্তব্য পালন করেন। ক্রুশভঙ্গকারীর মর্যাদায় তিনি খ্রীষ্টানদের বিভ্রান্তির ব্যাপক প্রচারাভিযান এবং ত্রিত্ববাদের বাতিল ইমারতকে অকাট্য দলিল ও যুক্তি-প্রমাণসমূহের মাধ্যমে বিধ্বস্ত করে দেন।

এ প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থাবলী থেকে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে, যা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে যে, তিনি ইসলামের সমর্থনে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে যে আযিমুশ্বান জিহাদ করেছিলেন, তার পেছনে কত শক্তিশালী চেতনা ও প্রবল প্রেমপূর্ণ আবেগ সক্রিয় ছিল। [৫]

তিনি লিখেছেনঃ "প্রকৃত মসীহ্‌র কাজ ইহাই হওয়া উচিত যে, তরবারির পরিবর্তে তিনি যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা হৃদয়কে জয় করবেন এবং রৌপ্য,স্বর্ণ, পিতল বা কাষ্ঠ খন্ড নির্মিত ক্রশগুলিকে ভেঙ্গে রেড়াবার পরিবর্তে ঘটনামূলক ও সঠিক প্রমাণ দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্মমতকে ধ্বংস করে দিবেন। যদি তোমরা বল প্রয়েগ কর, তবে তোমাদের বল প্রয়োগ এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ হবে যে তোমাদের নিকট নিজেদের সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। প্রত্যেক অজ্ঞ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি যখন দলিল দ্বারা পরাজিত হয়, তখন তরবারী বা বন্দুকের প্রতি হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু এরূপ ধর্ম কিছুতেই খোদাতাআলার প্রেরিত ধর্ম হতে পারে না, যা কেবল তরবারির সাহয্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রসার লাভ করতে পারে না " (কিশতিয়ে নূহ)।

তিনি লিখেছেন: "প্রতিশ্রুত মসীহর অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের মৌলিক ও মোক্ষম উদ্দেশ্য আহাদীস নববী (সা.)-তে বর্ণিত হয়েছে এই যে, তিনি খ্রীষ্টান জাতির 'দাজ্জাল' তথা মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণাকে দূর করবেন এবং তাদের ক্রুশীয় ধ্যান-ধারণা বা ক্রুশীয় মতবাদকে খন্ডন করে দেখিয়ে দিবেন। সুতরাং এ বিষয়টি আমার হাত দিয়ে খোদা তা'লা এরূপভাবে সুসম্পন্ন করেছেন, যার ফলে খ্রীষ্টধর্মের মূলোৎপাটন হয়েছে (মূলনীতির অবসান ঘটেছে)। আমি খোদাতা'লার নিকট হতে পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সপ্রমাণ করে দিয়েছি যে, সেই 'অভিশপ্ত মৃত্যুর ওপরেই সর্বতোভাবে ক্রুশীয় নাজাত বা পরিত্রাণ নির্ভরশীল, তা কোনক্রমেই হযরত ঈসা (আ.)-এর দিকে আরোপিত হতে পারে না। কোনক্রমেই লা'নত বা অভিশাপের মর্ম কোনও সত্যবান মহাপুরুষের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না।

সুতরাং পাদ্রীদের সম্প্রদায় উক্ত অভিনব-পদ্ধতির প্রশ্নটির দ্বারা, যা কি-না বস্তুতপক্ষে তাদের ধর্মকেই নস্যাৎ করে, এমনই নিরুত্তর হয়ে পড়ে যে, এ গবেষণা ও সত্যাবিস্কার সম্বন্ধে যারা যারাই অবহিত হয়েছেন, তাঁরা বুঝে গিয়েছেন যে, এই উচ্চ-পর্যায়ের গবেষণা ক্রুশীয় ধর্মকে চূর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছে। কোন কোন পাদ্রী সাহেবের পত্রাবলী থেকে আমি জেনেছি যে, তাঁরা এই চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্তকর গবেষণায় একান্তভাবে ভীত হয়ে পড়েছেন এবং বুঝে গিয়েছেন যে, এর দ্বারা ক্রুশীয় ধর্মের ভীত ধূলিস্যাৎ হবে এবং এর পতন অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।" (কিতাবুল বারীয়্যাঃ পৃঃ২৬২)।

তিনি লিখেছেনঃ "হে মুসলমানগণ! শ্রবণ করো এবং মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। ইসলামের পবিত্র প্রভাব রোধ করার জন্যে খ্রীষ্টান জাতি যেরূপ কুটিল কুৎসা রটনা ও প্রবঞ্চনামূলক উপায় অবলম্বন করেছে এবং

কঠোরতম পরিশ্রম সহকারে ও পানির মত টাকা পয়সা ব্যয়ে তা প্রচার ও বিস্তারের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এমন কি, অতি লজ্জাজনক উপায়সমূহ ও উদ্দেশ্য অবলম্বন করা হয়েছে, যার উল্লেখ হতে এই রচনাকে পবিত্র রাখাই শ্রেয়ঃ।

খ্রীষ্টান জাতি ও ত্রিত্ববাদের সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে এগুলি এরূপ যাদুকরী কার্যকলাপ যে, যে-পর্যন্ত খোদা তা'লা তাদের এই যাদুর বিরুদ্ধে সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরাক্রমশালী হস্ত প্রদর্শন না করবেন এবং অলৌকিক শক্তির দ্বারা এই যাদুর ধাঁ-ধাঁ ছিন্নভিন্ন করে না দেবেন, সে পর্যন্ত এই ফিরিঙ্গী জাতির প্রতারণা থেকে সরলচিত্ত জনগণের মুক্তি লাভ সম্পূর্ণ কল্পনাতীত ও ধারণা-বহির্ভূত। অতএব, খোদাতা'লা এই যাদু বা প্রতারণা পন্ড করার উদ্দেশ্যে এই যুগের খাঁটি মুসলমানকে এক মো'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন) প্রদান করেছেন।

অর্থাৎ তিনি তাঁর এই দাসকে স্বীয় ইলহাম,কালাম এবং বিশিষ্ট-আশিস ও কল্যাণসমূহ দ্বারা সম্মানিত ক'রে এবং স্বীয় পথের (ইসলাম-ধর্মের) সূক্ষ্ম-তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান দান ক'রে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় প্রেরণ করেছেন এবং বহু স্বর্গীয় উপহার এবং মহান অলৌকিক ব্যাপার এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানও তত্ত্বসমূহ তাকে দান করেছেন, যেন এই স্বর্গীয় প্রস্তরের সাহায্যে ফিরিঙ্গীদের যাদুর দ্বারা প্রস্তুত সেই মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা যায়।

সুতরাং হে মুসলমানগণ! এই অধমের আগমন সেই যাদুর অন্ধকারকে দূর করার জন্যে খোদাতা'লার তরফ হতে এক মোযেজা। যাদুর মোকাবেলায় দুনিয়ায় অলৌকিক-নিদর্শনও কি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক ছিল না? তোমাদের দৃষ্টিতে কি ইহা বিস্ময়কর ও অসম্ভব বোধ হয় যে, এরূপ অতি জঘন্যতম স্তরের প্রবঞ্চনাসমূহের বিরুদ্ধে, যা যাদুর স্তরে গিয়ে পৌছেছে, খোদাতা'লা সত্যের এইরূপ এক জ্যোতিঃ প্রদর্শন করেন, যা অলৌকিক শক্তির প্রভাব রাখে? (ফাতেহ্ ইসলাম ঃ পৃঃ ৪,৫)।

কলমের জিহাদের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছেনঃ "যেহেতু আমি ত্রিত্ববাদের ভ্রান্তি ও খারাপিসমূহ সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি, সেহেতু জগতের চল্লিশ কোটিরও বেশী (বর্তমান প্রায় ২৩০ কোটি-প্রকাশক) লোক হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদাস্বরূপ মনে করে বসে থাকার এই বেদনাদায়ক দৃশ্য আমার অন্তরে এতই আঘাত দিয়েছে যে, সারা জীবনে তার চেয়ে কঠিন মর্মপীড়া কখনও ঘটেনি।

বরং দুঃখ-বেদনায় যদি মৃত্যু বরণ আমার পক্ষে সম্ভব হতো, তাহলে এই দুঃশ্চিন্তা আমাকে বিনাশ করে দিত যে, কেন এই সকল লোক 'এক-অদ্বিতীয়' খোদাকে ছেড়ে অধম-অক্ষম এক ব্যক্তির উপাসনা করছে এবং কেন এরা সেই মহিমান্বিত নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) ওপর ঈমান আনয়ন করে না, যিনি সঠিক হেদায়ত ও সত্য পথের নির্দেশ সহকারে জগতে আগমন করেছেন। এই আশঙ্কা রয়েছে যে, এই দুঃখ ও বেদনার আঘাতে আমার জীবনাবসান না ঘটে যায়!..... এবং এই মর্মবেদনায় আমার অবস্থা এই, যদিও অন্যান্য মানুষ বেহেশ্‌ত কামনা করে থাকে।

কিন্তু আমার বেহেশ্‌ত এই যে, আমি যেন আমার জীবদ্দশাতে মানুষকে এই শেরক (অংশীবাদিতা) হতে নিস্কৃতি লাভ করতে এবং খোদা তা'লার মহিমা ও প্রতাপকে প্রকাশমান হতে দেখে যাই। আমার আত্মা সর্বক্ষণ দোয়া করে 'হে খোদা! আমি যদি তোমারই পক্ষ হতে থেকে প্রেরিত হয়ে থাকি এবং তোমার ফযল ও কৃপার ছায়া যদি আমার ওপরে থাকে, তাহলে তুমি আমাকে সেইদিন দেখাও, যখন হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর ওপর হতে এই মিথ্যে অপবাদ অপসারিত হয় যে, তিনি না-কি খোদা হবার দাবী করেছিলেন। এক দীর্ঘকাল থেকে আমার পাঁচ ওয়াক্তের দোয়া এই যে, খোদাতা'লা এই সব লোকদের চক্ষু দিন, এবং তারা তাঁর তৌহীদ তথা একত্বে বিশ্বাসী হোক; তাঁর রসূলকে সনাক্ত করুক এবং ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত আকীদা থেকে তৌবা করুক।"(তবলীগে রিসালতঃ৭ম খন্ড, পৃঃ ৭১-৭২)।

"ক্রুশভঙ্গের (কাস্‌রে সলীব) জন্যেই আল্লাহ আমার নাম দিয়েছেন 'মসীহে-কায়েম', যাতে হযরত মসীহ (আ.)-কে যে ক্রুশ ক্ষত-বিক্ষত ও বিচূর্ণ করেছিল, সে ক্রুশকে যেন অন্য সময়ে মসীহ্ এসে ভঙ্গ করেন; কিন্তু ঐশী-নিদর্শনাবলীর দ্বারা, মানবীয় হস্ত দ্বারা নয়। কেননা খোদার নবী পরাভূত অবস্থায় থেকে যেতে পারেন না। অতএব, খ্রীষ্টিয় বর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবার খোদা তা'লা ইচ্ছা করেছেন যেন ক্রুশকে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র হাত দিয়ে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করেন।" (হাকীকাতুল ওহীঃ, পৃঃ ৮৪)।

"একজন মুত্তাকী মাত্রই এ বিষয়ে বুঝতে পারেন যে, এই হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর মাথায় যখন ইসলামের ওপর হাজারো হামলা হলো, তখন এরূপ একজন মুজাদ্দিদ (ঐশী সংস্কারক)-এর প্রয়োজন ছিল, যিনি ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা সুপ্রমাণ করেন। হাঁ, এই মুজাদ্দিদের নাম এজন্যে 'মসীহ্ ইবনে মরিয়ম' রাখা হয় যে, তিনি ক্রুশভঙ্গের ('কাসরে সলীব') জন্যে এসেছেন। খোদাতা'লা চান যে, মসীহ্ (আ.)-কে যেমন কি-না পূর্বকালে ইহুদীদের ক্রুশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, এখন খ্রীষ্টানদের ক্রুশ থেকেও যেন উদ্ধার করেন।

যেহেতু খ্রীষ্টানেরা মানবকে খোদা বানাবার জন্যে অনেক কিছুই মিথ্যে রচনা করেছে, সেহেতু আল্লাহ্ তা'লার গায়রত (আত্মাভিমান) চেয়েছে যে, মসীহের নামেই এক ব্যক্তিকে প্রত্যাদিষ্ট (মা'মুর) ক'রে খ্রীষ্টানদের রচিত সেই মিথ্যাকে নস্যাৎ ক'রে দেন। ইহা খোদার কাজ এবং তা এই লোকদের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর।" (আঞ্জামে আথমঃ পৃঃ ৩২০,৩২১)।

"ইসলামের প্রারম্ভিক কালে-----নিরূপায় হয়ে তলোয়ার ব্যবহার করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তলোয়ারের দ্বারা জবাব দেয়া হয় না, বরং কলম এবং যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়। এ জন্যই এ যুগে খোদাতা'লা চেয়েছেন যে, তলোয়ারের কাজ যেন কলমের দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং লেখনীর দ্বারা মুকাবিলা করে বিরুদ্ধবাদীদেরকে পরাস্ত করা হয়। সে জন্য এখন কলমের জবাব তলোয়ার দ্বারা দেয়ার চেষ্টা-প্রয়াস কারও পক্ষে শোভনীয় নয়।" (মালফুজাত, ১ম খন্ড)।

(চলবে)

অতীত দিনের কিছু কথা

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী
(মরহুম)

দিন, ক্ষণ, মাস, বর্ষ পাড়ি দিয়ে এক দুই করে জীবনের অনেকগুলি বছর অতিক্রম করেছি। এখন ভাটির টানে শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেহ, মন, লেখনি ক্রমশ:ই যেন শ্রান্ত হয়ে আসছে। জীবনের এতগুলি দিন কি প্রকারে, কোথা দিয়ে যেন এক নিমিষে কোথায় হারিয়ে গেল, ঠাওর করে উঠতে পারছি না। জীবনটা যেন স্বপ্নের চাইতেও ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছে। এর-ই মধ্যে হারিয়েছি অনেক বন্ধু-বান্ধব, ক্ষণজন্মা, আত্মত্যাগী, সত্য-সাধক মনীষীবৃন্দকে, যাঁদের মন-প্রাণ ছিল মধুময়, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, মায়া- মহব্বতে ভরপুর, যারা রেখে গেছেন ঈমানে আমলে বিরল দৃষ্টান্ত, যাঁদেরকে কখনো ভোলা যায় না। জীবন-সায়াহ্নে বসে মনে পড়ে হারিয়ে যাওয়া সেই সকল মনীষিগণকে।

সত্য-নিষ্ঠার জন্য যে সকল সাধক বীর মনীষিগণ বহু লাঞ্চনা, গঞ্জনা, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ-কষ্ট অকাতারে সহ্য করেছেন, এমনকি সত্যকে রক্ষার নিমিত্তে তাঁরা অম্লান বদনে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করে নিয়েছেন, এই সকল সত্য-সাধক মনীষিগণের আত্মত্যাগ সম্পর্কে একটু ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সুখে-দঃখে, বাধা-বিপত্তিতে ও সর্বাবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল এবং আত্মবিশ্বসে বলীয়ান হয়ে ধৈর্য্যের মাধ্যমে সকল প্রকার বাধা-বিপদ অতিক্রম করে সত্যের পথে তাঁরা অটল ছিলেন। পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "যামানার কসম, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, সত্যের ওপর অটল থাকতে পরস্পরকে উপদেশ প্রদান করে এবং ধৈর্যধারণ করার জন্য পরস্পরকে উপদেশ দেয়। সে যাহোক, অত্র প্রবন্ধে আমি হারিয়ে যাওয়া সেই সকল বুযুর্গাণে দ্বীনের কথা উল্লেখ করতে প্রয়াস করছি, যারা আমাদের কাছ থেকে যবনিকার ওপারে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে, বহু দুরে চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁদের কীর্তি সমূহ, যা কখনো ভোলা যায় না, এটাই তাঁর মহৎগুণের পরিচয় প্রদান করে।

বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুরের সার্কেল অফিসার ছিলেন মরহুম খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব। পদের কোন গর্ব বা অহংকার তার মধ্যে ছিল না। ক্ষমতানুযায়ী বহু আহমদী যুবককে তখনকার সময়ে পি, এল, এ, এবং অন্যান্য চাকুরী দিয়েছিলেন। তাঁর কথা ছিল, কোন আহমদী যুবক যেন বেকার না থাকে। ঢাকার বর্তমান বকশীবাজার দারুত তবলীগের জায়গাটি খরিদ করার পিছনে তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এটি ছিল একটি হিন্দুর বাড়ি। দুটি পাকা ঘর, একটি দক্ষিণ দিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে। দক্ষিণ দিকের একতলা পাকা ঘরটি দুই-কামরা বিশিষ্ট, তিনদিকে ছিল খোলা বারান্দা, যা ভেঙ্গে বর্তমানে ছয়তলা করা হয়েছে। তখনকার দিনে জামা'তের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। প্রথমে এই বাড়িটি ভাড়ায় নেওয়া হয়। বাড়ির মালিক দেশ বিভাগের আগেই কলকাতা চলে যায়। তজ্জন্য জনাব খলিলুর রহমান সাহেবকে কয়েকবার কলকাতায় উক্ত জমির মালিকের কাছে যেতে হয়েছে। বহু চষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান সময়ের তুলনায় খুবই অল্পদামে বাড়িটি খরিদ করা হয়।

যাহোক, জনাব খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব যখন বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিত পুরের সার্কেল-অফিসার, তখন তাঁরই তবলীগে এককালের নামযাদা উকিল জনাব আনিসুর রহমান ও সাব রেজিষ্টার জনাব আবুল হোসেন সাহেব বয়আত গ্রহণ করে পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার অধীন শিমুলিয়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। আমরা উভয়েই পাকুন্দিয়া এবং পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়নের বাসিন্দা। আহুতিয়া গ্রামের সন্নিকটে পাঁচগাতিয়া গ্রামে জায়গীর থেকে মসুয়া এম,ই, স্কুলে আমাদের পাঠ্য অবস্থায় তিনি ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনা বিভাগে যোগদান করেন। অত:পর যুদ্ধের অবসানে সাব-রেজিষ্ট্রার হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি যখন বাজিতপুরের সাব-রেজিষ্ট্রার, তখন বাজিতপুরের সার্কেল অফিসার হলেন জনাব খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব। যাহোক, পরবর্তীতে সাব-রেজিষ্ট্রার আবুল হোসেন সাহেব তাঁর জন্মস্থান সিমুলিয়া গ্রাম থেকে কটিয়াদি থানাধীন সাহাবী হযরত রইস উদ্দিন খাঁন (রা.) এর বাড়ির সন্নিকটে নাগের গাঁয়ে একটি বাড়ি করেন। আমি নাগের গাঁয়ে তার সেই বাড়িতে গিয়েছি। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ শহরেও আরেকটি বাড়ি করেন। তাঁর দুই বিবি ছিলেন। ছোট বিবি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেবের কন্যা। সৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেব এককালে নায়েব আমীরও ছিলেন।

জনাব খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব যখন ফরিদপুর জেলার এ, ডি, এম, তখন তারই তবলীগে এককালের নামজাদা খ্রীষ্টান পাদ্রী ডা: উইলিয়াম হুসেন উদ্দিন খান প্রকৃত-সত্যকে উপলব্ধি করে বয়আত গ্রহণ করে পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। সে ১৯৫১ কিংবা ১৯৫২ সালের কথা। ঢাকা সালানা জলসায় ডঃ উইলিয়াম হুসেন উদ্দিন খানের একটি বক্তৃতা ছিল, যাতে 'তিনি কেন খ্রীষ্টান হয়েছিলেন'- এ বিষয়ে তাঁর জীবনের ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন যে, 'মুসলমান থেকে খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য দায়ী একমাত্র আলেম সমাজ। তারা বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে মদীনার মাটির নীচে শোয়ায়ে রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে আছে কবে নাগাদ খ্রীষ্টানদের নবী ঈসা (আ.) আসমান থেকে নেমে এসে তাদেরকে উদ্ধার করবেন। এই বিশ্বাসের ফলেই খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মোকাবেলায় পরাস্ত হয়ে বহু নামজাদা আলেম খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করে উল্টো পথের যাত্রী হয়েছে। যেমন, মৌলবি হামিদ উদ্দিন খান, মৌলবি আব্দুল্লাহ্ বেগ, পাদ্রী ইমামুদ্দীন, মৌলবি হুসামউদ্দিন (বোম্বাই) মৌলবি কাজী সফর আলী, মৌলবি আব্দুর রহমান সহ অন্যান্য আরও অনেকে। আমি স্বয়ং তাঁর সাক্ষী। করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানদের খোদার-পুত্র খোদা-যীশুর (ঈসা আ.) মৃত্যু সাব্যস্ত করতে কাশ্মীরে তার কবর দেখিয়ে খ্রীষ্টানদের ধর্মকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। মুসলমান থেকে খ্রীষ্টান হওয়ার স্রোত বন্ধ হলো। খ্রীষ্টানদের ধর্ম-বিশ্বাস একটা মিথ্যা স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণে তাদের কোনই ধর্ম থাকে না।

তখন প্রাদেশিক আমীর ছিলেন মরহুম জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। তিনি ছিলেন বাঁকুরা জেলার অধিবাসী। চাকুরী জীবনে তিনি ছিলেন জজ সেরেস্তাদার। তিনি তখন কুমিল্লায় থাকতেন। জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন সাবেক ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। তখন ঢাকার সালানা জলসার মেহমানগণের সংখ্যা এক'শ পুরা হতো কি-না সন্দেহ। তখন খাওয়া-দাওয়া হতো মাটির সানুকে। মনে পড়ে জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব, জনাব মওলানা ফারুক আহমদ সাহেবের পিতা মরহুম জনাব মমতাজ আহমদ সাহেব এক সাথে মাটির সানুতে আমরা ভাত খেয়েছি। জনাব মরহুম মওলানা মমতাজ আহমদ সাহেব ছিলেন একজন বিজ্ঞ-আলেম। মিষ্টি মধুর, সদালাপী, রসিক-ব্যক্তি। তিনিই সর্ব প্রথম কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদে হাত দেন। যা কি-না পাক্ষিক আহমদীতের ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতো। তাঁর মনটা ছিল খুবই উদার, স্নেহ, মহব্বতে ভরপুর। রসিকতার সুরে তার মনের অনেক কথা বলে তিনি আমাদেরকে হাসাতেন।

তিনি ছিলেন শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী। পবিত্র আহমদী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার আগে তার এলাকায় তিনি ছিলেন খ্যাতমানা। এলাকাবাসী তাঁকে খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। কিন্তু পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হওয়ার পর নবীর সুন্নাত অনুযায়ী তার ওপর শুরু হয় মোখালেফাতের প্রবল ঝড়-তুফান। এমনকি তজ্জন্য ইট পাটকেলও খেতে হয়েছে তাঁকে। যাকে দেখলে লোকে দূর থেকে সালাম দিতো, তিনিই হলেন সমাজের বুকে হাসি-তামাশার, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্র। রাস্তা দিয়ে চললে লোকে তাঁর প্রতি আঙ্গুল সংকেত করে বলতো, 'ঐ দেখ, কাদিয়ানী লোকটা যাচ্ছে। লোকটা বলে কি-না, হযরত ঈসা (আ.) অন্যান্য নবীগণের ন্যায় মারা গেছে। তাঁর কবর না-কি কাশ্মীরে বিদ্যমান। একথাটা কি কখনো সত্য হতে পারে? আমরা বাপা-দাদা চৌদ্দ পুরুষ যাবত যা বিশ্বাস করে পালন করে আসছি, তা কি কখনো মিথ্যা হতে পারে? আমাদের আলেম-ওলামা বলছে এককথা, আর তিনি বলছেন কি-না তার উল্টা অদ্ভূত ও নতুন কথা' এই বলে হাসি তামাশা করত। যাহোক, এ সম্বন্ধে তিনি প্রায়শই হযরত জিয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করে বলতেন যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন যে, "ইহা ('এলম') উঠে যাবে।" হযরত জিয়াদ (রা.) বললেন যে, ইয়া রসূল (সা.) 'এলম' কি করে উঠে যেতে পারে? যেহেতু আমরা কুরআন শরীফ পাঠ করছি। আমাদের সন্তান সন্ততি পাঠ করবে, তাদের সন্তান-সন্ততি পাঠ করবে। এমনিভাবে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে? উত্তরে হুযূর (সা.) বলেন, ওহে জিয়াদ! তোমাকে তো আমি এই শহরের একজন জ্ঞানী লোক বলে মনে করতাম। ইহুদী, খ্রীষ্টানগণ কি তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে না? কিন্তু আমল করে না।" সত্যকে গ্রহণ করার পেছনে বিদ্যার গর্ব একটি বড় বাঁধা। মাওলানা সাহেব বলতেন যে, পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হওয়ার আগে আমার মধ্যেও বিদ্যার অহংকার-গর্ব ছিল। অত:পর যখন আমার সৌভাগ্য হলো এবং আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি কিছুই জানি না, কিছুই শিখিনি। কিছুই বুঝিনা। জীবনভর গাড়ী গাড়ী কেতাব-হাদীস পড়ে যা শিখেছি, সবই বৃথা। আমাকে নতুন করে আবার শিখতে হবে। অন্যান্য আলেম ওলেমার ন্যায় আমারও ধারণা ছিল হযরত ঈসা (আ.) আসমান থেকে নেমে এসে কাজে লেগে যাবেন।

প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, বিশ্বাস ছিল যে কাফেরদেরকে হত্যার বর্তমান এই আনবিক যুগে কাফেরগণ কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে প্রাণ দিবে? বিদ্যার অহংকারে এমনি অন্ধ ছিলাম যে, সহীহ্ বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আগমন করে ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করবেন। বিভিন্ন হাদীস শরীফে পাওয়া যায় যে, লবন যেমন পানিতে গলে যায়, তদ্রুপ হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নি:শ্বাস-প্রশ্বাসে কাফেরগণ আপনা-আপনিই মরতে শুরু করবে। তাদের সাথে ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করার প্রয়োজনটা কি? এই সকল হাদীস নিয়ে ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করে ভেবে দেখার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা শক্তি তখন আমার ছিল না। সে যা-হোক, মওলানা মমতাজ আহমদ সাহেব বেশির ভাগ সময় ঢাকার কেন্দ্রে অবস্থান করতেন। একবার তিনি উথলী জামাতে এসে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। সম্ভবত তার হাতে দুইজন বয়আতও গ্রহণ করেছিলেন। উথলী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম ডা: আমীর হোসেন সাহেবের সাথে ছিল তার খুবই হৃদ্যতা। অবসর মুহূর্তে মাঝে মধ্যে তারা উভয়ে অতীত জীবনের হারিয়ে যাওয়া ঘটনাবলী বর্ণনা করে হাসাহাসি করতেন।

এখানে আমি আরেকজন বুযুর্গের কথা উপস্থাপন করছি। যিনি আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাবনিকার ওপাড়ে চলে গেছেন। তিনি হলেন কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানাধীন বাহাদুরপুর গ্রামের মীর আব্দুল মজিদ সাহেব। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয়, মর্যাদা সম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ, নম্র-ভদ্র ও অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র

আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হওয়ার আগে তিনি পীরগিরি করতেন। তাঁর অনেক ভক্ত ছিল। বর্তমানে গোলাপ নগরে সলেমান ফকিরের আস্তানায় যে প্রতি বৎসর বহু ধুমধামের সাথে উরস হয়, সেই সলেমান ফকির ছিল তার ভক্ত। যা হোক, মীর আব্দুল মজিদ সাহেব যুগ-ইমামের তালাশে বহু জায়গা সফর করেছেন। অবশেষে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর দাবির কথা শুনে তিনি উথলী এসে মরহুম ডা: আমীর হোসেন সাহেবের হাতে আরো কয়েকজন ভক্তসহ ১৯৫৭ সালে বয়আত গ্রহণ করে পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

অত:পর তাঁর অন্যতম ভক্ত মরহুম আব্দুল বারি সাহেব, তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর মওলানা মুহিবুল্লাহ্ সাহেব বাহাদুর পুর গিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে মীর আব্দুল মজিদ সাহেবকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করত জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। অত:পর মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব, মোয়াল্লেম মরহুম নুরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব এবং মৌলবি আবু তাহের সাহেব বাহাদুর পুরে কয়েকবার গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেই ইন্তেকাল করায় এবং এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়ার কারণে সক্রিয়ভাবে বর্তমানে সেখানে কোন জামা'ত নেই। এখানে আমি আরেকটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রাক্তন সদর জনাব আবুল কালাম আজাদ সাহেবের বাড়ি বাহাদুরপুর গ্রামে মীর আব্দুল মজীদ সাহেবের বাড়ির অতি সন্নিকটে। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন মীর আব্দুল মজীদ সাহেবের অতিশয় ভক্ত।

যাহোক, মাওলনা মহিবুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায়ের লোক। তিনি ছিলেন হাদীস বিশারদ একজন পন্ডিত-ব্যক্তি। হাদীস শরীফে পান্ডিত্যের জন্য তাঁকে আমরা 'হাদীসের ডিকশনারী' বলে ডাকতাম। কর্ম জীবনের প্রথম দিকে তিনি হুগলী জেলার কোন এক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতেন এবং হাদীসের পবিত্র-বাণী অনুযায়ী যুগ-ইমাম সম্পর্কে চিন্তা, ভাবনা, গবেষণা, করতেন। বড়ই কাতর হয়ে দোয়া-দরূদের সাথে যুগ-ইমামের সন্ধান করতেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর করুন কণ্ঠের দোয়া কবুল করলেন। এবং আহমদীয়া জামা'তের সন্ধান পেয়ে ১৯৪৪ সনে কলিকাতা আঞ্জুমানে দ্বিধাহীন চিত্তে, সজ্ঞানে, সুস্থ-শরীরে বয়আত গ্রহণ করে পবিত্র আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন। অত:পর জামা'তের খেদমতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

জনাব নুর উদ্দিন সাহেবের আদি নিবাস ছিল বর্তমান নরসিংদী জেলার অধীন রামপুর গ্রামে। আহমদী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার আগে তাঁর বিবাহ হয় মামাতো বোনের সাথে। তাঁদের উভয়ের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর নবীর সুন্নত অনুযায়ী শুরু হয় মোখালেফাত। 'কাফের হয়ে গেছেন' বলে মোল্লারা দিলেন ফতোয়া। তারই প্রেক্ষিতে একদিন তিনি তার শ্বশুরালয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজনরা চারদিকে ঘিরে তাকে চেপে ধরল যে, হয় তাকে আহমদীয়াত ছাড়তে হবে, নয়তো তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। তাদের চাপে দিশেহারা হয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মনের দুঃখে গভীর রাত্রে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরিয়ে নদীর ওপারে প্রেমারচরে আহমদী ভাইদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন কটিয়াদি থানার অন্তর্গত পাইকশা নিবাসী অসিউজ্জামান খান সোনা মিয়া উপস্থিত হলেন। নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব তাঁর সম্মুখে গিয়ে এসব ঘটনা বলে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তখন অসিউজ্জামান খান সোনা মিয়া সহানুভূতির সুরে তাকে বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, তুমি কাঁদছ কেন, শান্ত হও, আমাদের কি মেয়ে-ছেলে নেই'?

আল্লাহ্ তাআলা যেন এই কথা কবুল করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অসিউজ্জামান খান সোনা মিয়ার মেজ কন্যার সাথে নুরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের বিবাহ হয়। তিনি সুমধুর সুরে আযান দিতেন, তাই মরহুম খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব তাকে বেলাল বলতেন। অসিউজ্জামান খান সোনা মিয়া ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন নামজাদা লোক। তিনি ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের একজন হোতা। সাহাবী হযরত রইসউদ্দিন খান (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তেরগাতী জামা'ত ব্যতীত তিনিই এতদঞ্চলে সর্বপ্রথম আহমদী।

মৌলবি আবু তাহের সাহেব অসিউজ্জামান খান সোনা মিয়া এবং সাব-রেজিষ্ট্রার আবুল হোসেন সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। এই দুই বুযুর্গ ব্যক্তি তবলিগী কাজে ছিলেন খুবই উৎসাহী। প্রায়শ:ই তারা তবলিগী কাজে প্রেমার চরে যেতেন। একদিন তাঁরা উভয়ে প্রেমারচরে তবলীগি কাজে গেলে ফিরার পথে তাদেরকে এগিয়ে দিতে সাথে এসেছিলেন আবু তাহের সাহেব। পথিমধ্যে বেতাল গ্রামের সন্নিকট এসে নদীর ওপারে কোন এক তাল গাছের নীচে বসে অসীউজ্জামান সোনা মিয়া এবং সাব-রেজিষ্ট্রার আবুল হোসেন সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণ করে পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। অত:পর তার বড় দুই ভাই আবু মুসা ফজলুল করীম ও আবু ঈসা সাহেব এবং তার মামা মওলানা তালেব হোসেন সাহেব বয়আত গ্রহণ করেন। মওলানা তালেব হোসেন সাহেব ছিলেন এতদঞ্চলে খুবই নামজাদা তেজস্বী আলেম। 'বাঘা মওলানা' নামে তিনি ছিলেন সর্বত্র পরিচিত। তার সম্মুখে কোন মৌলবি কথা বলতে সাহস পেত না। তিনি বলতেন, আমি মৌলবিদেরকে চল্লিশটায় হালি গুণি। প্রথমে তিনি আহমদী জামা'তের বিরোধী ছিলেন। তাঁর এক ভগ্নী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে স্বপ্নে দেখার পর তারা উভয়ে মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের হাতে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তাঁদের বয়আত গ্রহণ করার পেছনে অসিউজ্জামান খান সোনা মিয়া ও সাব রেজিষ্টার আবুল হোসেন সাহেবের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মৌলবি আবু তাহের সাহেব ছাত্র জীবনে আহুতীয়া গ্রামে জায়গীর থেকে শালুরাদি হাফিজী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেন। এখানে আমি আরেকজন বুযুর্গের কথা উল্লেখ না করে পারছি না, আর তিনি হলেন জনাব আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব। ১৯২০ সালের দিকে বয়আত গ্রহণ করে আজীবন তিনি নিরলস ভাবে জামা'তের খেদমত করে গেছেন। দীর্ঘদিন পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব নিষ্ঠার সাথে জামা'তের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

১৯৭৫ সনে ঢাকার সালানা জলসা। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পর বাড়ি যাচ্ছি। ঢাকার সালানা জলসায় যোগদানের পর বাড়ি যাব মনস্থির করলাম। ঢাকার সালানা জলসার দুইদিন পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সালানা জলসা। জলসার একদিন পূর্বে আমি ঢাকায় গেলাম। অতীত দিনের অনেক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যাঁদের প্রাণঢালা মহব্বতের কথা ভুলা যায় না। বহুদিন পর মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হৃদয় নিংড়ানো মহব্বতের সুরে বললেন, এবার আমি আপনাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া না নিয়ে ছাড়ছি না। তিনি বেশ কিছু দিন কটিয়াদী জামাতে কর্মরত ছিলেন। তখন থেকেই আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতা। বাধ্য হয়ে তাঁর আবদার আমাকে রক্ষা করতে হলো। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা, আত্মত্যাগী, সত্য-সাধক মনীষি। তাঁর মন প্রাণ ছিল মধুময়, স্নেহ-মহব্বত, প্রেম-প্রীতি, মায়ামহব্বতে ভরপুর। সদালাপি, সত্য-নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্য-পরায়ণ, তাকওয়াশীল, আর ব্যবহারিক জীবনে ত্যাগী-পুরুষ। আজীবন নিরলস ও নিষ্ঠার সাথে তিনি তার কর্তব্য পালন করে গেছেন।

যাহোক মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, আরো কয়েকজন একসাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসায় যোগদান করলাম। খুব সম্ভব বৃহস্পতি ও শুক্রবার দিন জলসা হয়েছিল। ইতিমধ্যে মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব আমাকে এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন। যথাসময়ে আমরা তাঁর বাসায় গিয়ে দাওয়াত পর্ব সেড়ে হযরত মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) এর মাজার শরীফ জিয়ারত করে ফিরে এলাম।

যেদিন বেতাল নিবাসী মরহুম মোয়াল্লেম হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেবকে সাথে নিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম, সেদিন ছিল সোমবার। তার তিন দিন আগে বৃহস্পতিবার আমার মা ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার সৌভাগ্য হলো না মায়ের সাথে শেষদেখা করার। আমার মা ছিলেন একজন ধর্মভীরু পুণ্যবতী মহিলা। মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কাতর প্রার্থনা করি, দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা যেন আমার মায়ের বিদেহী-আত্মাকে বেহেশ্‌তের সর্বোচ্চ স্থান দান করেন, আমীন, সুম্মা আমীন।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৯ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ১৫/০৫/২০১৪ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশী বাজার, ঢাকা বরাবর পৌঁছাতে হবে। আগামী ২১,২২,২৩ এবং ২৪ মে, ২০১৪ তারিখে ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আবেদনকারীকে অবশ্যই ২০/০৫/২০১৪ তারিখ সোমবার জামেয়ার অফিস সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ

(১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ. এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর (৫) ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি-বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে (৯) আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং এই তিন বছর জামা'তের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১১) আবেদনকারীকে অবশ্যই খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১২) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিটিউড-এ ভাল ফলাফল করতে হবে। (১৩) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামা'তের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতগ্রহণকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে। (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে (জ) জামা'তি/মজলিসি চাঁদা পরিশোধ রয়েছে মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামা'তের এমন দু'জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামা'তের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তা উল্লেখ করুন।

বি. দ্র. প্রত্যেক স্থানীয়-জামা'তে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১ অথবা ০১১৯১৩৬৩৪১৮।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

ভাষা আল্লাহ্‌র বিশেষ দান

মাহমুদ আহমদ সুমন

মাতৃভাষাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা অপরিসীম। পবিত্র কুরআন পাঠে জানা যায় পৃথিবীতে যত নবী রাসূলের আগমণ ঘটেছে, তারা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই আল্লাহ্‌পাকের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। এছাড়া পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, সব ভাষাই আল্লাহ্‌ কর্তৃক সৃষ্ট। একেক জাতির জন্য একেক ভাষা সৃষ্টি করা এটা আমাদের ওপর আল্লাহ্‌ তা'লার বিশেষ কৃপা। সকল জাতিকে হেদায়াতের জন্য যেমন আল্লাহ্‌পাকের পয়গম্বর এসেছেন, তেমনি সকল জাতির স্ব-স্ব ভাষাতেই আল্লাহ্‌ তা'লার ওহী-ইলহাম নাজিল হয়েছে।

আল্লাহ্‌ তা'লা প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় আসমানি কিতাব অথবা কিতাববিহীন প্রত্যাদিষ্টকে ওহী দ্বারা পাঠিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন 'আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে তার জাতির ভাষাতেই ওহীসহ পাঠিয়েছি, যাতে সে স্পষ্টভাবে আমাদের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারে' (সূরা ইবরাহীম: ৫)।

মানুষের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার সাথে তার উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আল্লাহ্‌ পাক বলেন 'আর তার নিদর্শনাবলীর মাঝে রয়েছে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বিভিন্নতাও। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে' (সূরা আর রূম: ২৩)। ভাষা ও রঙের এই বিভিন্নতা সুপরিকল্পিত, যার পশ্চাতে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। আকাশ-মালা ও বিশ্বজগত সেই পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টি। বর্ণের ও ভাষার বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমন-নির্গমন ঘটে চলেছে। কিন্তু তবুও এই বিভিন্নতার অন্তরালে স্থায়ীভাবে প্রবহমান রয়েছে একতা ও মানবতার ঐক্য। আর মানবতার এই ঐক্য যুক্তিগ্রাহ্যভাবে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে সৃষ্টিকর্তাও একজনই। মানবজাতির সূচনালগ্নে ভাষা ছিল একটিই এবং তা ছিল ইলহামী-ভাষা। এরপর মানুষ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে এলাকা পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষারও পরিবর্তন হতে থাকে। এভাবেই সূচনাতে মানুষের রংও ছিল একই রকম। এরপর গ্রীষ্ম, শীত এবং নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা অনুযায়ী তার রঙ্গেরও পরিবর্তন হতে থাকে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ফেব্রুয়ারি মাস অত্যন্ত গুরত্ববহ একটি মাস। ১৯৫২ সালের এই মাসের ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'-এ দাবিতে বাঙালিরা যখন রাজপথে নেমে এসেছিল, তখন পাকিস্তানিরা তার জবাব দিয়েছিল বুলেটের মাধ্যমে। বাংলার দামাল ছেলেরা মাতৃভাষা বাংলার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ করেছিল রঞ্জিত। সেই রক্তের ছোঁয়া পেয়ে আশ্চর্য দ্রুততায় গোটা জাতি জেগে উঠেছিল তার শেকড়ের টানে। পাকিস্তানিদের সৃষ্টি করা সাম্প্রদায়িকতা তাতে কোন বাধ সাধতে পারেনি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি সেদিন এক হয়ে একটিই প্রতিজ্ঞা করেছিল- মায়ের ভাষার সম্মান রাখবই, নিজের সংস্কৃতিকে ধারণ করবই।

আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে, এ বিষয়ে জানছে।

সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার আর একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদ ও দু'লাখ মা বোনের ইজ্জত হারানো শাশ্বত এ বাঙ্গালীর রক্তের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠা বাংলাদেশ, আজ পরম শ্রদ্ধায় দেদীপ্যমান সারা বিশ্বের জনগণের কাছে। রক্তের বিনিময়ে এ বাংলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা। এক ঝাঁক থোকা থোকা নাম সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারের মতো অনেকের জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাঁর ভাষা, স্বকীয়তা এবং গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিল।

মাতৃভাষাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা অপরিসীম। পবিত্র কুরআন পাঠে জানা যায় পৃথিবীতে যত নবী রাসূলের আগমণ ঘটেছে, তারা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই আল্লাহ্‌পাকের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। এছাড়া পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, সব ভাষাই আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট।

রক্তের আখরে লেখা এই ২১শে ফেব্রুয়ারি। ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবতর উত্থান ও অভ্যুদয়ের দিন। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সংস্কৃতির হৃৎপিন্ড। বাঙলা আমাদের দেশমাতৃকা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা আমাদের প্রিয় ভাষা। বাংলা ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সবার মাতৃভাষা। এই ভাষার মর্যাদার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল ধর্মাবলম্বীদের রয়েছে অবদান।

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে মর্যাদায় উন্নীত করতে ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু, দিতে হয়েছে লাখ প্রাণের তাজা রক্ত। মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত দেয়ার যে ইতিহাস বাংলার বীর সেনারা সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে আর এমন দৃষ্টান্ত নেই। বুকের তাজা রক্তের আখরে সৃষ্ট বাংলাভাষা, সময় পরিক্রমায় ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন এই বাংলাদেশ।

সমগ্র জাতি এই মাসে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের কথা, দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে যারা পরাক্রমশালী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতার সূর্য পতাকা ছিনিয়ে এনেছিল। ঐ বিজয়ের পিছনে ছিল কোটি কোটি মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় ও অকুণ্ঠ সমর্থন। ছিল ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বহু রাষ্ট্র ও শান্তিকামী মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা। সর্বোপরি ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্ব। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনে 'যার যা আছে' তা নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে জুগিয়েছিলেন প্রেরণা।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় প্রধান চারটি আসমানি কিতাবের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি 'তাওরাত' হিব্রু ভাষায়, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 'ইঞ্জিল' সুরিয়ানী ভাষায়, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি 'যাবুর' ইউনানী ভাষায় এবং বিশ্ব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর প্রতি 'আল কুরআন' আরবী ভাষায় নাযিল হয়। হযরত রাসূল করীম (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। তার কাছে মানবজাতির দিশারী এবং সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে সর্বশেষ আসমানী কিতাব 'আল কুরআন' অবতীর্ণ হয়। এ ঐশী ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী। বিশ্ব নবীর মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষাণা করেছেন, 'নিশ্চয় আমরা এই কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা দিয়ে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহকারী জাতিকে সতর্ক করতে পার' (সূরা মরিয়ম: ৯৮)। আরো বলা হয়েছে 'আর এর পূর্বে মূসার কিতাব ছিল এক পথপ্রদর্শক ও কৃপা। আর এ কুরআন হলো প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ ভাষায় এমন এক সত্যায়নকারী কিতাব যে, তা জালেমদের সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দেয়' (সূরা আহকাফ: ১৩)। তাই আমরা বলতে পারি কোন ভাষা অপবিত্র নয় বরং সকল ভাষাই ঐশী ভাষা। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মাতৃভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে থাকে, আর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাও মাতৃভাষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, "নামাযের মধ্যে নিজের ভাষায় দোয়া করা উচিত। কেননা, নিজের ভাষায় দোয়া করলে পূর্ণ আবেগ সৃষ্টি হয়" (মলফুযাত, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৪)।

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, "নামায আশিস মন্ডিত হবে না যতক্ষণ না নিজের ভাষায় নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা না কর। .....মাতৃভাষায় মানুষের বিশেষ এক সাধ মিশ্রিত থাকে। এ জন্য নিজের ভাষায় অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে নিজের কামনা-বাসনাকে রাব্বুল আলামীনের কাছে নিবেদন করা উচিত" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৫)।

তাই প্রত্যেক আহমদী মুসলমান কুরআন হাদীসের নির্ধারিত আরবী দোয়াগুলো পাঠ করার পর নিজ নিজ মাতৃভাষায় সেজদায় অবশ্যই দোয়া করে থাকে। বাঙলা বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৫ম ভাষা। আর আমাদের রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা। এ ভাষার প্রগতি, উন্নতি উৎকর্ষের জন্য কারো কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তের বিনিময়ে বাঙালি খুজে পায় নিজস্ব সত্তা। আর এর ফলেই বাঙালি লাভ করে স্বাধীন রাষ্ট্র।

মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে নিজ মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে দিক আর আজকের দিনে বাঙালি সংস্কৃতির নামে যে বেহায়াপনা করা হচ্ছে, তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুক। গভীর ভাবে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব বীর শহীদ ও বীর সৈনিকদের, যারা এ ভাষার জন্য লড়েছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন। আমরা যেন আমাদের লেখায়, কথায়, চলনে-বলনে মাতৃভাষাকে আরও বেশি করে বিশুদ্ধভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি, আর আল্লাহ্ পাকের এই বিশেষ-দান সকল ভাষাকে শ্রদ্ধার সাথে দেখি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তার তৌফিক দান করুন, আমীন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার

সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

(৫ম কিস্তি)

কাশফে পূর্ববর্তী কোন কোন বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ : ১৮৭২ সনে হযরত আকদাস স্বপ্ন যোগে হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.) এর সাথে একই পাত্রে আহার করেন এবং হৃদ্যতার সাথে বাক্যলাপ করেন। এই সময়ে প্রায়ই হযরত বাবা নানক সাহেব রহমতুল্লাহে আলাইহের সাথে স্বপ্নযোগে তাঁর দেখা হয়।

তিনি নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ সনে তিনি হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহে আলাইহের সাথে স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর এবং সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানীর আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। (হায়াতে তায়েবা, পৃ:৪৪)।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হযরত রাসূল (সা.) এর প্রতি এমন প্রেম ও ভালোবাসা পোষণ করতেন যে, যার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই তিনি (আ.) সর্বদায় আঁ হযরত (সা.) এর ওপর দরূদ পাঠ করতেন। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহম্মাদেওঁ ওয়া আলে মুহাম্মদ।

তিনি (আ.) বলেছেন, "খোদার পরে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেমে আমি বিভোর। ইহা যদি কুফরী হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফির"। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পরে রাসূল পাক (সা.)-কে বেশী মহব্বত করতেন। এক সত্যিকার প্রেমিক-সাধকের মুখে মনে প্রাণে সর্বদা যেরূপ তার প্রেমিকের কথা জাগরিত হয়ে থাকে, তদ্রূপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অবস্থা ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উর্দু ভাষায় এক কবিতায় বলেছেন :

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হয়েছি।
আমি তাঁরই হয়ে গিয়েছি ॥
যা কিছু তিনিই, আমি কিছুই নই।
প্রকৃত মীমাংশা ইহাই।"
(উর্দু দুররে সামীন)

এরূপে "কিতাবুল বারিয়ায়" তিনি বলেছেন, সত্যের ভয়ে তাঁকে খোদা বলি না, কিন্তু খোদার কসম, তাঁর সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা দর্শনের দর্পন স্বরূপ। অপর এক স্থানে হুযূর এরশাদ করেছেন, আমি দিবা-রাত রাসূল করীম (সা.) এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করার মধ্যে নিয়োজিত থাকতাম। কারণ রাসূল করীম (সা.) এর উসিলা ছাড়া কোন আধ্যাত্মিক পুরস্কার যা নবী, সিদ্দিক, শহীদ, সালেহ্ লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের উসিলা অবলম্বন কর।" তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এটাই প্রমাণ করেছেন যে তিনি মুহাম্মদ (সা.) এর আশেকে সাদেক ছিলেন (সুলতানুল কলম, পৃ: ৪৪)।

১৮৮২ সনের এক রাতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর এত অধিক দরূদ পাঠ করলেন যে, মনপ্রাণ তদ্বারা সৌরভময় হয়ে গেল। সেই রাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, স্বচ্ছ সুমিষ্ট জলের আকারে জ্যোতির মশকসমূহ সহ ফেরেশ্‌তাগণ হযরত আকদাস (আ.) এর ঘরে আসছেন। তাদের মধ্যে একজন বললেন যে, এই আশিসগুলো তা যা তুমি মুহাম্মদের প্রতি পাঠিয়েছিলেন। (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

এ সময়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওপর ইলহামে ইলাহীর দরজা খুলে যায় এবং হযরত আকদাস (আ.) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত ওহী ইলহাম এর দরজা বন্ধ হয়নি, খোলা ছিল। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আহমদ! আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে আশিস দিয়েছেন। সুতরাং তুমি ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে যে আঘাত শত্রুদের ওপর এনেছ, তা তুমি করনি, বরং আল্লাহ্ তা'লা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে কুরআন করীমের জ্ঞানদান করেন, যাতে তুমি ঐ সব লোককে সতর্ক কর, যাদের পূর্বপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি এবং যাতে অপরাধীদের পথ পরিস্কার হয়ে যায়। লোকদেরকে বল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে আদিষ্ট (মা'মুর) করা হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি (হায়াতে তাইয়েবা, পৃ: ৭১)।

এ সময় তিনি (আ.) আরো একটি ইলহাম প্রাপ্ত হলেন, তুমি লোকদেরকে বল, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রেম করতে চাও, তা হলে এর একটি মাত্র পথ আছে এবং তা হলো, আমার আনুগত্য কর। আমরা আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা ঘোষণা করি।

হযরত আকদাসকে আল্লাহ্ তা'লা আদেশ করেছেন যে, যদি তুমি আমার দরবারে উচ্চস্থান লাভ করতে চাও, তাহলে আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি অনেক বেশী দরূদ পাঠ কর। এবং এদিকে হযরত আকদাস (আ.)কে মান্য করা এবং তার আনুগত্য করার জন্য এ যুগের মানুষকে আদেশ করলেন যে, এ যুগে যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম করতে চাও, তাহলে তোমরা এ যুগের মা'মুর অর্থাৎ আমি হযরত

ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আমাকে মান্য কর এবং আনুগত্য কর।

সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ (হায়াতে তাইবে, পৃঃ ৭৩)।

মা'মুরিয়াত সম্পর্কে হযরত আকদাস (আ.) প্রথম ইলহাম প্রাপ্ত হওয়ার পরে বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণ করেন। আবার ১৮৮৮ সনে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওপর 'বয়আত' করার ইলহাম করেন।

'তুমি যখন সংকল্প কর, তখন আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর কর। আমাদের সামনে আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। এ আদেশ তোমাকে করা হয়েছে। যারা তোমার হাতে বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণ করবে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্ তা'লার হাতে বয়আত করবে। আল্লাহ্ তা'লার হাত তাদের হাতের ওপরে থাকবে এবং যারা হেদায়াত পালন করে, তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' "প্রচারক বিনীত গোলাম আহমদ আফা আনহু" (হায়াতে তাইবো, পৃঃ ৯৪)

মহান আল্লাহ্ তা'লা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে ১৮৮৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ইলহামের মাধ্যমে বয়আত নেওয়ার আদেশ করেন। তদনুসারে ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ তারিখে লুধিয়ানা নিবাসী মিয়া আহমদ জান সাহেবের বাড়িতে সর্বপ্রথম বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। প্রথম দিনে কাশ্মীর মহারাজার রাজ-চিকিৎসক স্বনাম খ্যাত হেকীম ও জবরদস্ত হযরত আলহাজ্জ মৌলবী নূরুদ্দীন (রা.) সহ সর্ব মোট ৪৭ জন বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর নিকট বয়আত করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

অত:পর আহমদীয়া জামা'তে বয়আত গ্রহণ তখন হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় চলে আসছে এবং বর্তমানে আহমদী মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কোটি কোটিতে এবং দিনের পর দিন বয়আতকারীদের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছে। তৎকালীন সময়ে ছিল শুধুমাত্র ভারত উপমহাদেশে, বর্তমানে পৃথিবীর দু'শত চারটি দেশে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন করীমে সূরা সফফ-এর ১০ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্মসহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন, মোশরেকগণ যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন (৬১:১০)।

বর্তমান যুগে এক বৈপ্লবিক স্রোত প্রবাহিত হতে দেখছি, যার ধারাবাহিকতা রোজ কিয়ামত কাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতি-ধর্মের মধ্যে মহান বিজয় ও গৌরব আনার জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সেনারা ইসলামের ঝান্ডা মহাগ্রন্থ আল কুরআন হাতে নিয়ে বিভিন্ন পথ ও পন্থায় সামনে এগিয়ে চলেছেন।

নতুন আকাশ নতুন জমিন :

জগৎ এখন কলুষিত হয়ে গেছে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার ওপর মানুষের বিশ্বাস নেই। ঠোঁট দিয়ে তাঁর নাম উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু হৃদয় তা হতে বিমুখ হয়ে গেছে, তাই খোদা তা'লা বলেছেন যে, আমি এখন নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টি করব। এর অর্থ এই যে, জগতের মৃত্যু ঘটেছে অর্থাৎ জগদ্বাসীর হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে, যেন মরে গেছে। কেননা খোদার চেহারা তাদের চক্ষুর অন্তরাল হয়ে গেছে এবং অতীতের সমূদয় ঐশী নিদর্শন কিস্‌সা কাহিনীতে পরিণত হয়ে গেছে। তাই খোদা তা'লা নতুন আকাশ নতুন জমিন সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছেন। সেই নতুন আকাশ ও নতুন জমিন কি? নতুন জমিন সেই পবিত্র-হৃদয়, যা খোদা স্বহস্তে প্রস্তুত করেছেন, যা খোদা হতে প্রকাশিত হয়েছে এবং যার দ্বারা খোদা প্রকাশিত হবেন। এবং নতুন আকাশ সেই সকল নিদর্শন, যা তাঁর দাস হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর হাতে তাঁরই আদেশে প্রকাশিত হচ্ছে। (কিশতিয়ে নূহ্, পৃঃ ১৭-১৮)

বনী ইসরাঈলী নবী হযরত মূসা (আ.) এর সিলসিলায় হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) ছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং খাতামুল খোলাফা। অনুরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সিলসিলায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। (কিশতিয়ে নূহ পৃঃ ৩০)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে" একথা সত্য। আফসোস সেই লোকদের জন্য, যারা কুরআন শরীফের ওপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই, যা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। 'কিয়ামতের' দিবসে কুরআন শরীফ তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদন্ড হবে (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ৪০)।

তিনি (আ.) বলেন, এ পর্যন্ত নবুওয়াতের যুগের তেরশত বছর (বর্তমানে চৌদ্দশত-প্রকাশক) অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং অভ্যন্তরীণ ভাবে ইসলাম তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। প্রকৃত মসীহ্‌র কাজ ইহাই হওয়া উচিত যে, তরবারির পরিবর্তে তিনি যুক্তি প্রমাণ দ্বারা হৃদয়কে জয় করবেন এবং রৌপ্য, স্বর্ণ, পিতল বা কাষ্ঠ নির্মিত ক্রুশগুলিকে ভেঙ্গে বেড়াবার পরিবর্তে গঠনমূলক ও সঠিক প্রমাণ দ্বারা খৃষ্ট ধর্মমতকে ধ্বংস করে দিবেন। যদি তোমরা বলপ্রয়োগ কর, তাহলে তোমাদের বলপ্রয়োগ একথার যথেষ্ট প্রমাণ হবে যে, তোমাদের নিকট নিজেদের সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। প্রত্যেক অজ্ঞ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি যখন দলিল দ্বারা পরাজিত হয়, তখন তরবারি বা বন্দুকের প্রতি হাত প্রসারিত করে, কিন্তু এসব ধর্ম কিছুতেই খোদা তা'লার প্রেরিত-ধর্ম হতে পারে না, যা কেবল তরবারির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রসার লাভ করতে পারে না।

যদি তোমরা এরূপ জেহাদ হতে বিরত হতে না পার এবং এতে ক্রোধান্বিত হয়ে সাধু ব্যক্তিগণের নামও দাজ্জাল (ধর্মের শত্রু) এবং মুলহেদ (নাস্তিক) রাখ, তাহলে আমি এই দু'টি বাক্য দ্বারা এ বক্তব্য শেষ করছি। অর্থাৎ তুমি বল, হে কাফেরগণ! আমি সেইরূপ ইবাদত করি না, যেইরূপে তোমরা ইবাদত কর (১০৯ : ২-৩)।

অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও দলাদলির যুগে তোমাদের তথাকথিত মসীহ্ এবং মাহ্‌দী কোন্ কোন্ ব্যক্তির ওপর তরবারি প্রয়োগ করবেন? সুন্নীগণের মতে শিয়াগণ কি এর যোগ্য নয় যে, তাদের প্রতি তরবারি চালানো যায় এবং শিয়াগণের বিবেচনায় সুন্নীগণ কি এইরূপ নয় যে, তাদেরকে তরবারি দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা যায়? অতএব যেহেতু তোমাদের অভ্যন্তরীণ ফেরকাগুলি তোমাদের আকিদা (ধর্মীয় বিশ্বাস) অনুসারে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, এমতাবস্থায় তোমরা কার কার সঙ্গে জেহাদ করবে? কিন্তু স্মরণ রাখ, খোদা তরবারির মুখাপেক্ষী নয়। তিনি তাঁর ধর্মকে ঐশী নিদর্শন দ্বারা জগতে বিস্তার দান করবেন এবং কেউ তা রোধ করতে পারবে না, এবং স্মরণ রাখ ঈসা আর কখনও অবতীর্ণ হবে না। কেননা, তিনি 'ফালাম্মা তাওয়াফ ফাইতানী" অর্থাৎ 'যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে' (৫: ১১৮, কিশতিয়ে নূহ-পৃঃ ৯২-৯৩) মোতাবেক মৃত্যুবরণ করেছেন।

(চলবে)

নবীনদের পাতা-

আকিকা ও জন্মদিন

আকীকার মাংস নিজেরাও খেতে পারবে এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদেরকেও দিতে পারবে।

আকীকা :

যুগ যুগ ধরে মুসলমানগণ তাদের সন্তানদের আকীকা করে আসছেন। কেননা হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার রাসূল (সা.) প্রত্যেকটি শিক্ষার ওপর নিজে আমল করে আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যেন ঐ ধারাবাহিতায় আমরা প্রত্যেকটি আমল করতে পারি।

আমাদের যে কোন ধরনের পুণ্য কাজ আল্লাহ্ তা'লার নিকট তখনই গ্রহণীয় হবে, যখন আমরা তা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) এর নির্দেশিত পন্থায় করবো। কিন্তু দুঃখের সাথে বর্ণনা করতে হচ্ছে আকীকা করার সঠিক বয়স পদ্ধতি আমাদের অনেকেরই জানা নেই। মূলত হাদীস শরীফ থেকে সন্তান জন্মের সপ্তম দিন ছাগল অথবা ঐ প্রজাতির কোন পশু জবাই করে আকীকা করার নিয়ম জানতে পারি। বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হওয়ার জন্য ফিকাহ্ আহমদীয়া অর্থাৎ আহমদীদের আইন শাস্ত্রে আকীকা সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তার অনুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হল–

"সন্তান জন্মের সপ্তম দিন মাথা মুন্ডন করা এবং চুলের সমপরিমাণ ওজনের রূপা বা স্বর্ণ সদকা করা, নাম রাখা এবং আকীকা করা সুন্নত (ইবনে মাজাহ্ বাব আকীকা-২২৮)। হাদীস শরীফে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আকীকা মানে হচ্ছে পশু জবাই করা। ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে দু'টি ছাগল বা দুম্বা এবং মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে একটি ছাগল বা দুম্বা, ইত্যাদি (অর্থাৎ ঐ প্রজাতির কোন পশু) জবাই করতে হয় (ইবনে মাজাহ্, বাব আকীকা পৃষ্ঠা-২২৮)। পশু পরিপূর্ণ বয়সের এবং হৃষ্ট-পুষ্ট হতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট বাচ্চার বয়সের ক্ষেত্রে সেই শর্ত প্রযোজ্য নয় যা কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আকীকার মাংস নিজেরাও খেতে পারবে এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদেরকেও দিতে পারবে। (মাংস) রান্না করে দাওয়াতও দিতে পারবে। গরীবদেরকেও এথেকে অংশ দেয়া উচিৎ। যদি কেউ অপারগ হয়ে দু'টি পশু জবাই না করতে পারে, সে ক্ষেত্রে একটি (পশু) দিয়েও (আকীকা) করা যেতে পারে।" (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা-১৮৩)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, প্রচলিত আকীকা প্রথা অর্থাৎ যে কোন বয়সের সন্তানের আকীকা করা অথবা গরু মহিষ ইত্যাদি পশু দিয়ে আকিকা করা হযরত রাসূল করীম (সা.) এর সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য নয়। সুতরাং রাসূল করীম (সা.) এর সুন্নত অনুযায়ী আমল করতে হলে সন্তান জন্মের সপ্তম দিন ছাগল অথবা ঐ প্রজাতির কোন পশু জবাই করে আকীকা করতে হবে।

জন্মদিন ঃ

আর একটি বিষয় হচ্ছে জন্মদিন পালন করার বিষয়টি। এটি একটি পশ্চিমা-রীতি, যা ধীরে ধীরে মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইসলামী শিক্ষার কোথাও এর কোন হদীস পাওয়া যায় না। যদি এ বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হয় যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) কি কখনও নিজের জন্মদিন পালন করেছেন? তিনি (সা.) কখনও তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে কারও জন্মদিন পালন করেছেন? যদি প্রশ্ন করা হয় যে রাসূল করীম (সা.) কি কখনও তাঁর কোন সন্তানের জন্মদিন পালন করেছেন? যদি প্রশ্ন করা হয় যে খোলাফায়ে রাশেদীনের কেউ কিংবা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) এর কোন সাহাবা (রা.) তাঁর অথবা তাঁর বংশের কারও জন্মদিন পালন করেছেন?

এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর যদি রাসূলে করীম (সা.) এর সুন্নত ও হাদীস মোতাবেক দেয়া হয়, তাহলে তা হবে, 'না'।

সুতরাং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) যা করেন নি এবং তারপর তাঁর কোন সাহাবা (রা.)-ও করেন নি, তাহলে সে কাজ আমরা কেন করব? আর এর উদ্দেশ্যই বা কি? যে কাজ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) করেন নি, তা করে আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার নিকট অধিক প্রিয় হতে পারবো? কখনই না। কেন না আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন, ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইউহবিব্‌কুমুল্লাহ্- অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমার আনুগত্য [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর অনুকরণ] কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আলে ইমরান-৩২)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা পেতে হলে রাসূলে করীম (সা.) এর অনুকরণ করতে হবে। কোন বিধর্মী সংস্কৃতির

অনুকরণ করা যাবে না। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মান্ তাশাব্বাহা বিকিউমিন ফাহুয়া মিন্‌হুম অর্থাৎ যে ব্যক্তি (নিজ ধর্মীয় রীতিনীতি ছেড়ে) অন্য কোন দলের অনুসরণ করে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত। (আবুদাউদ) এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্য জাতির কুসংস্কৃতির অনুকরণ করে, তাহলে তার সম্পর্কে এ ধারনাই পোষণ করতে হবে যে, তার হৃদয় অন্য জাতির রীতিনীতি ও নিয়ম কানুনে প্রভাবিত হয়ে মানসিকভাবে তাদের গোলাম হয়ে গেছে। যখন কোন ব্যক্তির নিকট অন্য জাতির রীতিনীতি ভাল লাগে, তখন নিজ জাতির বিশ্বাস বা রীতিনীতি তা অপেক্ষায় খুব নগণ্য মনে হয়। অত:পর মানসিক গোলামীর ফলে অন্ধভাবে সেই জাতির রীতিনীতির ওপর আমল শুরু করে। আর এভাবেই সে ধীরে ধীরে নিজ বিশ্বাস থেকে দূরে সরতে থাকে।

উক্ত হাদীসটিতে রাসূল করীম (সা.) মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে কখনও অন্য জাতির কুসংস্কৃতির অনুকরণ করো না বরং মুসলমানদের যে রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো সব ধরণের আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি থেকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করো এবং সে অনুযায়ী আমল করো।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সঠিক বিষয়টি বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

নাসের আহমদ
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

সর্বাধিক গুরুত্বের বিষয় শিক্ষা

আমাদের যান্ত্রিক-জীবন পরিচালনার যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে শিক্ষা। আসলে শিক্ষা এমনই এক পদ্ধতি যা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বুদ্ধি, বিবেক, আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে এবং তাকে স্বনির্ভর ও আত্ম-প্রত্যয়ী করে গড়ে তোলে। দেশ, জাতি, সমাজ ও পরিবার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিক্ষা। শিক্ষা-দিক্ষার ফলে মানুষের মাঝে নৈতিকতার সৃষ্টি হয়, মূল্যবোধ সঞ্চারিত হয় এবং মনুষ্যত্বের সূচনা হয়।

মানুষের জীবন যেমন যান্ত্রিক, শিক্ষা-পদ্ধতিও তেমনি যান্ত্রিক। শিক্ষার কোন শেষ নেই। যত পড়বো, ততো জানবো, যত জানবো ততই জ্ঞান লাভে সক্ষম হব। আর যতই জ্ঞান অর্জন হবে, ততোই দৃঢ়তা সম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারবো। আর দৃঢ়তা সম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারলেই জীবন স্বার্থক। তাই এ বিষয়ে প্রতি দৃষ্টি রেখেই প্রত্যেকেরই উচিত শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান অর্জনে তৎপর হওয়া।

"একবার না পারিলে দেখ শতবার" কবিতার শুধুমাত্র এই একটি লাইনের মাধ্যমেই শিক্ষার নানান ভঙ্গি, নানান ভাব, নানান ভাষায়, নানান ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে, যদি আমরা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করি।

আমাদের যান্ত্রিক-জীবনের কোন কোন দিক, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রেখে নিজ দায়িত্ব পালন করছে, কিন্তু শিক্ষার নির্দিষ্ট কোন দিক বা বিষয় নেই। এমন কোন দিকই নেই যা শিক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়।

পারিবারিক পরিমন্ডল গঠন, সমাজ গঠন, দেশ গঠন, জাতি গঠন, আদর্শ নাগরিক গঠন, স্কুল-কলেজ গঠন, বিভিন্ন রকমের আদর্শ প্রতিষ্ঠান গঠন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষার অনন্য অবদান রয়েছে।

একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই এগুলো প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই সমান গুরুত্বের অংশীদার। শিক্ষা দীক্ষাকে পরিত্যাগ করে অন্ধকারময় জীবন প্রতিষ্ঠা করে কোন লাভ নেই। কেননা এ জীবনের নেই কোন আশা, নেই কোন ভরসা, নেই কোন সম্মান, নেই কোন শ্রদ্ধা। এ জীবনে রয়েছে শুধু দুর্গতি। কেননা অশিক্ষিত লোকজন পারে না কোন ভালো কর্ম সংস্থান করতে, পারে না নিজেকে আত্ম-প্রত্যয়ী হিসেবে সমাজের কাছে স্বীকৃতি দিতে। পারে না জ্ঞানমূলক বাণী মানুষের কাছে প্রচার করতে, পারে না নিজ পরিবারকে আত্মসংযমী করে গড়ে তোলতে, পারে না পরিবারের সুখ, শান্তি ও উন্নতি ঘটাতে।

শুধু তাই নয় অশিক্ষিত লোকজন কখনই পারে না দেশ, জাতি, সমাজ গঠনে অবদান রাখতে। সমাজে তাদের কোন মূল্যায়ণ নেই। তারা পরিত্যক্ত বস্তুর মতো। আর তাদের দ্বারাই সৃষ্টি হয় বেকারত্ব।

তারা পারে না নিজেদের জন্য কোন কর্ম-সংস্থান গড়ে তোলতে। অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে তারা নানা রকমের সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। যেমন-চুরি, ডাকাতি, হত্যা, নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, প্রভৃতি। তাহলে তাদের দ্বারা সমাজ, জাতি এবং দেশ কি উপকৃত হচ্ছে? তারা কি কোন সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে, ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে? একমাত্র তারাই দেশ ও জাতির ধ্বংস নিয়ে আসছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, অন্ধকারময় জীবন অন্ধকারের দিকেই গতিশীল থাকবে এবং এভাবেই নিজ পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হবে এবং দেশের লোকজন ভবিষ্যৎহীন অন্ধকারময় জীবনের দিকে অগ্রসর হবে। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে অন্ধকারময় জীবন। একমাত্র শিক্ষাই পারে এ অন্ধকার দূরীভূত করে জ্ঞানের আলো প্রদান করতে।

আমাদের বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন–

"চীন দেশে গিয়ে হলেও শিক্ষা লাভ কর।"

সুতরাং ইসলামের দিক থেকেও শিক্ষার মূল্যায়ণ চূড়ান্ত। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অর্জন। মানুষ জ্ঞান কেন অর্জন করে? কিংবা ইসলামে কেন জ্ঞান অর্জনকে মূল্যায়ণ করা হয়েছে? একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, জ্ঞান অর্জন মানে চেতনা-শক্তির বৃদ্ধি এবং নৈতিক

চিন্তাশক্তি সৃষ্টি। জ্ঞানের কোন পরিসীমা নেই। জ্ঞান যতই অর্জিত হবে, ততোই মানুষ নৈতিক-জ্ঞান প্রাপ্ত হবে এবং তখনই মানুষ বাস্তব জীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিখবে এবং এভাবেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি স্বজাগ থাকতে শিখে। উপরন্তু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে, প্রকৃত ইসলামকে স্ব-মনোচক্ষু দ্বারা অঙ্কন সম্ভব। আর যাই হোক, একজন প্রকৃত জ্ঞানী-ব্যক্তি দুনিয়ার সবকিছুর ওপর ইসলামী-জীবনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা রাখে। কেননা ইসলামী জীবনই যে প্রকৃত পক্ষে নৈতিকতার আওতাভুক্ত, তা অনুধাবন করাই জ্ঞানের চরম পরিসীমা। সুতরাং স্পষ্টতই আমরা বুঝতে পারছি, একমাত্র শিক্ষাই জ্ঞানের সূচনা। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হওয়া, যাতে নৈতিকতার চরম সীমায় পৌঁছানো যায়।

রেজোয়ানা করিম (রোদেলা)

আহমদনগর

একটি সম্বোধন ভাল লাগার অনুভূতি

১৫/২০ বছর আগে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকার জাঙ্গালিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। শিশির ভেজা সকালে কলা বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পাখির কণ্ঠের মতো এক শিশুর কোমল কণ্ঠের ডাক শুনলাম।–'এই বাঙ্গাল'–'এই বাঙ্গাল'?

চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে খুঁজে পেলাম না। অবশেষে দক্ষিণে এক প্লট দূরে তাকিয়ে দেখি একটি দিগম্বর শিশু এই শীতে দাঁড়িয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করে ডাকছে–'এই বাঙ্গাল'। যেহেতু ওটা 'গারো' বা মান্দাই পাড়া ছিলো। সেখানে বাঙ্গালি তেমন ছিল না।

আমি আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে পূলকিত বা গর্ববোধ করলাম। যেহেতু এ পর্যন্ত আমাকে কেউ বাঙ্গাল বলে ডাকেনি।

তবে এ দেশের বিরাট জনগোষ্ঠী আমার শৈশব থেকে আমাকে 'কাদিয়ানী' বলে ডেকে এসেছে। অথচ দিব্যি আমি বাঙ্গালী। এই ছোট্ট শিশু আমাকে চিনতে পারলেও বিশাল সমাজের শিক্ষিত-সমাজ আমাকে চিনতে পারেনি। অন্ধ থেকেছে। আমি শিশুটির জন্য গর্ববোধ করলাম। এক অনাবিল আনন্দে বুকটা ভরে গেল।

স্কুলে সহপাঠীরা কাদিয়ানী বলতো–শুনতে চাইল না কাদিয়ান আমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে পূর্ব পাঞ্জাবের একটি গ্রাম, যেখান থেকে বিশ্বব্যাপী সত্যিকার মুসলমানের একটি আন্দোলন শুরু হয়ে আজ ২০/২৫ কোটি লোকের একটি দল ২০৪টি দেশে ইসলাম প্রচার (সত্যিকার) করে চলেছে। শিশুটির কথায় গর্ববোধ হলো। আনন্দিত হলাম। হে আমাদের দেশবাসী, সচেতন হউন, আল্লাহ্ আমাদের হেদায়াত দান করুন।

সরকার মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামান

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

প্রকাশিত হয়েছে

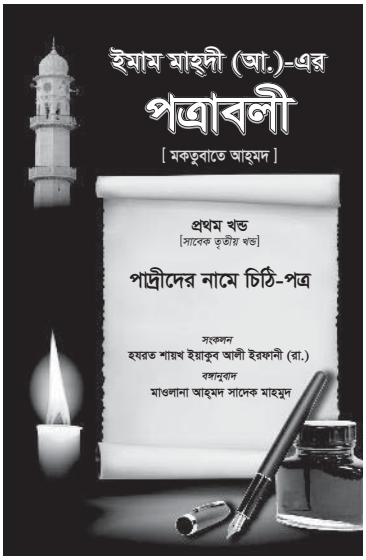

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

“জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁকে পরিপূর্ণ করা হবে”

প্রকাশনা জগতে তাঁর অবদান

হযরত মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে যে, “জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁকে পরিপূর্ণ করা হবে।” তাঁর জীবদ্দশায় অমূল্য কুরআনের তফসীর গ্রন্থ ও বহু পুস্তক পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে ইসলামের মহান সেবার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত বাক্যাবলী পূর্ণতা লাভ করেছে। ১৯০৬ সনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ‘তাশহিযুল আযহান’ নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকায় তিনি নিজে সম্পাদক হন। ১৯১৩ সালে সাপ্তাহিক আল ফযল প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সনে কুরআনের প্রথম পারা উর্দু ও ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। সুবিখ্যাত তফসীরে কবীরসহ শত শত পুস্তক-পুস্তিকা এবং অনেক খুতবা, বক্তৃতা ভাষণ প্রকাশিত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) শুধু মাত্র কুরআনের তফসীর গ্রন্থ তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর রচনা করে ইসলামের সেবায় যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা-ই তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, আমাকে খোদা তা’লা স্বয়ং কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন আর আমি ব্যতিত দুনিয়াতে আর কাউকেই খোদা তা’লা কুরআনের জ্ঞান দান করেন নি। আর আমি সমস্ত দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি, কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা বর্ণনায় কেউ আমার মোকাবেলা করুক।

বহির্দেশে ইসলাম প্রচারক প্রেরণ ঃ

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে “সে পৃথিবীতে আসবে এবং তাঁর সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যধিমুক্ত করিবে।” এছাড়া আরও উল্লেখ আছে, “সে বৃদ্ধি লাভ করবে। এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে।”

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯১৪ সনে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে খেলাফতে আসীন হয়ে বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করতে থাকেন। হযরত মসীহ মাওউদ (রা.)-এর উপর অবতীর্ণ একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল “ম্যায় তেরে তবলীগকো দুনিয়াকে কিনারো তক পহচাউঙ্গা” অর্থাৎ আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব। এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগান্তকারী পদক্ষেপ সমূহের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। একে একে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি মোবাল্লেগ প্রেরণ করতে থাকেন। আজ আমরা সেই বীজগুলোকে বিশাল বিশাল বৃক্ষরূপে দেখছি।

১৯৫১ ইং সনে তিনি কাযী আব্দুল্লাহ সাহেবকে মোবাল্লেগ হিসেবে লন্ডন প্রেরণ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাদেক এবং আব্দুর রহীম নাইয়ার সাহেব যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম আফ্রিকার মিশনারী হিসাবে প্রেরিত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মৌলভী মোবারক আলী (বাঙ্গালী) এবং মালিক গোলাম ফরিদকে বার্লিনে প্রেরণ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর খলীফাতুল মসীহ সানী ও মুসলেহ মাওউদ (রা.) লন্ডন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৩৪-৩৮ সনের মধ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালি এবং আলবেনিয়ায় মিশন স্থাপন করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোতে তিনি মোবাল্লেগ প্রেরণ করেন আর সারা বিশ্বে আহমদীয়াতের প্রচারের দরজা খুলে যায়।

জামা’তের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান ঃ

জামা’তের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্টিত করা ও কর্মকান্ড সমূহকে বেগবান করার লক্ষ্যে মুসলেহ মাওউদ (রা.) জামা’তকে কয়েকটি অংগসংগঠনে বিভক্ত করেন। ১৯২২ ইং সনে পনের উর্দ্ধ মহিলাদের অঙ্গ সংগঠন লাজনা ইমাইল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৮ ইং সনের ১৩ ই জানুয়ারী আহমদী যুবকদের জন্য মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া ১৯৪০ ইং সনের ২৬শে জুলাই চল্লিশোর্ধ পুরুষদের অঙ্গসংগঠন মজলিস আনসারুল্লাহ গঠন করেন। এই অঙ্গসংগঠনগুলো মূল জামা’তের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এর সুফল আমরা বর্তমানে পূর্ণরূপে দেখতে পাচ্ছি। জামা’তের সদস্যগণ নিজ নিজ অঙ্গ সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে পূর্ণ উদ্দমে কাজ করার ফলে জামা’তী কর্মকান্ড অনেক বেগবান হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) -এর সুদীর্ঘ বায়ান্ন বৎসর খেলাফতকালে জামা’ত অসাধারণ উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। জামা’ত একটি মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রচার দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছে যায়। মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ্ তা’লার এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে মু’মিনদের হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়তর হয়। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল, “সোমবার শুভ সোমবার”। সে অনুযায়ী মুসলেহ মাওউদ (রা.) এক শুভ সোমবার এই ধরাধামে আসেন আর এক শুভ সোমবার ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর এই দুনিয়া ছেড়ে খোদা তা’লার সান্নিধ্যে চলে যান।

লাকী আহমদ, তেবাড়ীয়া, নাটোর

ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান

ইসলাম আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। হযরত রাসূল করীম (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন 'সত্য ধর্ম'সহকারে যাতে সকল ধর্মের ওপর ইসলাম বিজয় লাভ করে। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় ইসলামকে বিজয় দান করার জন্য আরেক মহাপুরুষের আগমন- বার্তাও বাইবেল, হাদীস শরীফ ও ইসলামের বহু অলি-দরবেশের লিখনী হতে জানা যায় আর তিনি হলেন খলীফাতুল্লাহ ও আল্-মুসলেহুল্ মাওউদ।

তিনি আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)। তাঁর সম্পর্কে ৫২টি নিদর্শন অক্ষরে অক্ষরে তাঁর বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতা পেয়েছিল। প্রায় ৫২ বছরের খেলাফত কালীণ জীবনের কার্যাবলীতে দেখা যায় আহমদীয়া তথা খাঁটি ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় সমগ্র বিশ্বে তিনি অসাধারণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁর এক একটি কর্মসূচীর সফলতা তাঁর 'মুসলেহ্ মাওউদ' হওয়ার অকাট্য-দলিল। তাঁর সফলতার অগণিত নিদর্শন বিদ্যমান এবং অসাধারণ গুণাবলীর বাস্তবরূপ দেখা গেছে।

তিনি (রা.) খাঁটি ইসলাম তথা আহমদীয়াত বিস্তারের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রেখেছেন। যেমন ১০০টি জ্ঞান বিষয়ক, তরবিয়তী ও আধ্যাত্মিক তাহ্‌রীক, বহির্বিশ্বে ৩১১টি মসজিদ নির্মাণ, ৪৬টি দেশে আহমদীয়া মিশন স্থাপন, ১৬৪ জন জীবন উৎসর্গকারী দ্বারা তবলীগের কার্য সম্পাদন, ১৬টি ভাষায় কুরআন করীমের প্রচার, ২৪টি দেশে ৭৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ২৮টি ধর্মীয় মাদ্রাসা, ৩১৭টি হাসপাতাল স্থাপন, প্রায় ৪০টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, স্বয়ং নিজে ২৫৫ খানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তিকা প্রণয়ন, ১০ হাজার ধর্মীয় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও খোতবা প্রদান। তিনি জামা'তের সার্বিক উন্নতির জন্য এবং কাজে কার্মে সুবিধার জন্য সংগঠনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। আহমদী মহিলাগণ ও জামা'তী কর্মকান্ডে যেন অংশ নিতে পারে এ ব্যবস্থাপনাও তাঁর দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী হাজারো মোবাল্লেগ খাঁটি ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনাকে স্বার্থক করে যাচ্ছেন। কুরআনের অমূল্য তফসীর, তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী এবং খুতবা পুস্তক জীবন্ত খোদার জীবন্ত নিদর্শন রূপে চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর রোপিত চারা গাছগুলো আজ বিশাল বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হয়েছে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যাঁর আগমনে নবী ও অলী আল্লাহ্‌গণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে। ৫২ বছরের খেলাফতকালে এমন একটি দিনও যায়নি যেদিন তাঁর শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই।

১৯৫৫ সালে নাইজিরিয়ার একটি সৈনিক পত্রিকা লিখেছিল, "নাইজিরিয়াতে ইসলাম খুব দ্রুতগতিতে প্রসারিত হইতেছে এবং ইসলামের এই বিজয় খৃষ্ট-ধর্মের জন্য বড় বিপদ!!" তিনি (রা.) বলেছেন, "আমি মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাপূর্ণকারী এবং আমিই ঐ মুসলেহ্ মাওউদ যার দ্বারা ইসলাম ধর্ম দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে এবং তৌহিদ বিশ্বময় কায়েম হবে।" আলহামদুলিল্লাহ্

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের এক নব দিগন্তের সূচনা করেন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৮৯ সালে ২৩ শে মার্চ মসীহ্ মাওউদ হিসেবে নিজেকে দাবী করেন আর বয়আত নেওয়া শুরু করেন। আর এভাবে ইসলাম আহমদীয়াত প্রচার শুরু হয়ে থাকে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর মৃত্যুর পর আহমদীয়া জামা'তের প্রথম খলীফা হযরত হাফিয মাওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) এর খেলাফত কালে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় ইসলাম দূরপ্রাচ্যে, ইউরোপে ও আমেরিকার বুকে আরও সু-প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর (রা.) মৃত্যুর পর হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদকে যুবক বয়সে খোদা তা'লা খেলাফতের আসনে বসালেন। দুনিয়া বললো একেতো ছোট্ট আর বিশ্বকে খেলাফতের কল্যাণে আশিস মন্ডিত করা, তদুপরি বিশ্বব্যাপী ইসলামের জয়ের আকাঙ্খা! এই জামা'ততো শেষ হয়েই যাবে।

শয়তানি শক্তি একের পর এক আক্রমণ করতে লাগল, যাতে করে খোদার হস্তে রোপিত এই বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। কিন্তু খোদার ফেরেশ্‌তারা তার সাহায্যে একত্রিত। তিনি (রা.) ঘোষণা দিলেন, আমাদের জামা'তের উন্নতির যুগে খোদা তা'লার ফজলে নিকটবর্তী। সেদিন দূরে নয়, যেদিন দলে দলে লোক এই জামা'তে প্রবেশ করবে। সেদিন নিকটে যখন গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর আহমদী হয়ে যাবে।

তিনি (রা.) বলেন, দেখ আমি একজন মানুষ এবং আমার পরে যে আসবে সেও মানুষই হবে যার যুগে এই বিজয় সম্পাদিত হবে। একদিকে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে রত খেলাফতে আহমদীয়া সমগ্র বিশ্ব "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"র বাণী দ্বারা অংশীবাদিত্ব ও ত্রিত্ববাদের মায়াজাল থেকে মুক্ত করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পতাকা তলে একত্রিত করছে। আর অপরদিকে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের আন্দোলন ও খেলাফতকে নিস্তব্ধ জন্য ১৯৩৪ সনে এ আওয়াজ উচ্চারিত হলো যে, কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খসিয়ে নেবে, এবং সারা পৃথিবীতে একজনও আহমদী থাকবে না। খোদা তা'লা যিনি 'খায়েরুল মাকেরীন' তিনিও পরিকল্পনা করলেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিটি ফুৎকারের বদলে হাজার হাজার সৎ প্রকৃতির লোকদের মুহাম্মদীয় পতাকা তলে একত্রিত করবেন। খলীফা যার কাজ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সুমহান বাণী ছড়িয়ে দেওয়া। তিনি (রা.) বজ্রননাদে ঘোষণা দিলেন, এখন খোদা তা'লার ডঙ্কা পূর্ণদ্যমে বাজতে প্রস্তুত। হ্যাঁ তোমাদিগকেই খোদা তা'লা আবার তার ডঙ্কা বাজানোর দায়িত্ব অর্পন করেছেন। হে ঐশী রাজত্বের বংশী বাদকগণ এই ডঙ্কায় আবার এত জোড়ে আঘাত কর, যেন দুনিয়ার কর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যায়। খোদা তা'লার বাদশাহত যেন এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সোজা চলে এসো, আর খোদার সৈন্য দলে ভর্তি হয়ে যাও।

খেলাফতের এই ডাকে হাজার হাজার হৃদয় 'লাব্বায়েক লাব্বায়েক' বলে এগিয়ে এল এবং তৌহীদের পতাকা হাতে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর গোলামগণ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো।

১৯৫৩ সালে আবারো খোদার প্রদীপকে মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু খোদা তা'লার ফজলে তাও বানচাল হয়ে গেল। তাঁর (রা.) ৫২ বছর ব্যাপী খেলাফতের এই যুগটির প্রতিটি মুহূর্ত বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য নিবেদিত ছিল।

তার (রা.) সময়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের

এক ঝলক আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খেলাফতের এই যুগে ১০০ টিরও অধিক শিক্ষামূলক, আধ্যাত্মিক ও তরবিয়তী তাহ্‌রীক এই মহান খলীফা করেছেন। যার মধ্যে অন্যতম তাহ্‌রীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ, বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন, খোদ্দামুল আহমদীয়, আতফালুল আহমদীয়া, মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ ও নাসেরাতুল আহমদীয়া। এগুলোর সুদূর প্রসারী ফল আজ জামা'ত পাচ্ছে ও আগামীতেও পেতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

এই মহান খলীফার খেলাফত কালে উপমহাদেশের বাইরে ৩১১ টি মসজিদ নির্মিত হয়। বিদেশে ৪২টি নতুন তবলীগ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৬টি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ হয়, ২৪ টি দেশে ৭৪ টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ৪০ টি পত্রপত্রিকা ইসলাম প্রচার ও তরবিয়তের জন্য চালু হয়। এই মহান খলীফা ইসলামের স্বপক্ষে ২২৫ বই রচনা করেন। ১৬৪ জন ওয়াকেফীন-এ জিন্দেগী দ্বারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের কাজ চালিযে যান। ১০ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন মজীদের এক অনন্য তফসীরও লিখেন।

খেলাফতের এই যুগে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ফলে ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রস্থল ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় আল্লাহু আকবার আওয়াজ উচ্চারিত হতে শুরু করে। স্পেনে মুসলমানদের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনার জন্য তবলীগ কেন্দ্র স্থাপন করেন। আফ্রিকায় যেখানে ক্রুশের পতাকা উড়ছিল ইসলামী ঝান্ডা উড্ডীন হওয়ার জন্য মুবাল্লেগীনদের সেখানে প্রেরণ করলেন। যারা স্বল্প সময়ে ক্রুশকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে শুরু করলো। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ইতিহাস তো অনেক ব্যাপক যা লিখে শেষ করা যাবে না।

খেলাফতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের যে গতিকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ অনুধাবন করেছে তা একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে তুলে ধরছি, আফ্রিকাকে বিশেষ করে ঘানার উপকূলবর্তী এলাকায় আহমদীয়া মতবাদ দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করেছে। শীঘ্র ঘানার সকল অধিবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হবে। এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়। যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তাই নিশ্চয় এটা খৃষ্টধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। ঠিক করে এটি বলা যায় না ক্রুশ অথবা হেলাল, কে আফ্রিকাকে শাসন করবে! আর আজ এই ফয়সালা হয়ে গিয়েছে যে আফ্রিকা হেলাল অর্থাৎ ইসলাম শাসন করবে। এরূপই হওয়ার কথা ছিল। কেননা খেলাফতের মাধ্যমে 'লে ইউযহেরাহু আলাদদ্বীনে কুল্লেহি'-এর দৃশ্য পৃথিবী অবলোকন করবে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

তিনি (রা.) বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের এক নব দিগন্তের সূচনা করেন। আজ আমরা সেই বীজগুলোকে বিশাল বিশাল বৃক্ষরূপে দেখছি। মহান আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকল আহমদীকে প্রকৃতভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের তৌফিক দিন, আমীন।

আহমদ উজ্জ্বল, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক

ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ২য় খলীফার অবদান অতি ব্যাপক। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর আগমনের উল্লেখ বাইবেলে রয়েছে, যাঁর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) করেছিলেন, যাঁকে লাভ করার জন্য এ যুগের মহাপুরুষ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিরবে নিভৃতে একেধারে চল্লিশ দিন, হুশিয়ারিপুরের এক বাড়িতে দোয়া করে কাটিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদ পেয়ে তাঁর জন্ম, ব্যক্তিত্ব, কর্মময় জীবন সম্পর্কে তাঁর জন্মের পূর্বেই সমগ্র জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর জন্মের পর বাস্তবিকই যিনি এক অসাধারণ প্রতিভা, অতুলনীয় জ্ঞান, অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শী ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। ৫১ বছর জামা'তে আহমদীয়ার খেলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে এক নিঃস্ব, দুর্বল, ছোট ও অসহায় জামা'তকে এক মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। উপমহাদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বহিঃর্বিশ্বের কোণায় কোণায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি হলেন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সন্তান, হযরত মুসলেহ মাওউদ, হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)। তাঁর (রা.) স্বর্ণোজ্জ্বল ও অবিশ্বরণীয় কর্মময় জীবনের কিছু দিক তুলে ধরছি। তাঁর কর্মময় জীবনের অন্যতম একটি দিক ছিল, জামাতে আহমদীয়াকে সাংগঠনিকভাবে সুসংগঠিত করে, তার ভিতকে মজবুত করা।

তিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে, জাগতিক বিচারে, তিনি ছিলেন অল্প বয়স্ক যুবক। যার ছিল না কোন সাংগঠনিক জ্ঞান, দক্ষতা, ছিল না সংগঠন চালানোর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা। ছিল না কোন টাকা পয়সা। ফলে জামা'তের ধ্বংসই ছিল অনিবার্য। কিন্তু এবারও এটাই প্রমাণ হলো– আল্লাহ যাঁকে খলীফা নির্বাচিত করেন, আল্লাহই তাঁকে সাহায্য করেন।

তিনি খলীফা হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে শিখান, উপলব্ধি করান-জামা'তকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বাস্তব পরিকল্পনা ও সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা। এজন্য তিনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার এক মাস পর সারাদেশের আহমদী প্রতিনিধিদেরকে 'পরামর্শের' জন্য কাদিয়ানে ডাকেন। পরামর্শের জন্য সদস্যদেরকে একত্রিত করা ছিল তার প্রথম সাংগঠনিক কাজ।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আহমদীদেরকেই যে শুধু সাংগঠনিকভাবে সুসংগঠিত করেছিলেন তা নয়। জামা'তের বাইরেও তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতার ছাপ পড়েছে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত হলো– (১) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ই কাশ্মিরের জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের সংগঠন, 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মির' কমিটি গঠন করেন। এবং ১৯৩১ সনে তিনি এর সভাপতিও ছিলেন।

(২) ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষেও তিনি অবদান রেখেছেন, খুতবা প্রদান করেছেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সম্বোধন করে বলেছেন– '২৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ সম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে। আর আজ তারা তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। তোমাদের উচিত তাদের এ দাবীকে মানা।' তাঁর এ বক্তব্যকেই পরবর্তীতে চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব যিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড ওয়াবেল গঠিত 'ভারতীয় স্বাধীনতা কমিশনের' প্রধান ছিলেন। তিনি তার হাউজ অব লর্ড এর ভাষণে প্রতিধ্বনিত করেন। এবং তখন অল ইন্ডিয়া রেডিও তা সম্প্রচার করে।

(৩) পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। কায়েদে আযম, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উপমহাদেশের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান, তখন মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশে আমাদের লন্ডন মসজিদের ইমাম তাকে বুঝান এবং আবার পাকিস্তান আন্দোলনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে জিন্নাহ সব সময়ই হুযূরের পরামর্শ নিতেন।

(৪) ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই হযরত

মুসলেহ মাওউদ (রা.) ইহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বকে সতর্ক করেছিলেন। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা শুনেনি। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে আবার মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা তাও শুনেনি। ফলে আজ তাদের এ অবস্থা।

১৯১৫ সালে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে, ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯২১ সালে সিয়েরালিওন, ঘানা, নাইজেরিয়া ও বুখারাতে তবলীগি কেন্দ্র চালু হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর সবুজ ইশতেহারে লিখেছেন– "সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাশীল ও হৃদয়বান হবে। এবং তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।" বাস্তবিক তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান- বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাথে ছিল আল্লাহতাআলার রহমত, ফযল ও ঐশী জ্ঞানের ছায়া। যার সুষ্ঠু ছাপ পড়েছে তাঁর কর্মে, তাঁর লিখনীতে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ২২৫ টি ছোট বড় বই লিখেছেন। এ ছাড়াও ১৯১৩ সনের আল ফযল পত্রিকা প্রকাশ করেছেন ও ১৯৫৫ সনে তারিখে আহমদীয়াত (আহমদীয়াতের ইতিহাস) সংকলনের জন্য ইতিহাসবিদ মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেবকে দায়িত্ব দেন। জগত সাক্ষী তাঁর লিখার শক্তি ছিল তাঁর যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুলনীয়। তাঁর লিখার জ্ঞান, গভীরতা, সূক্ষ্মতা, বিচক্ষণতা ও ব্যাপকতা শুধু আহমদীদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রেখে দিয়েছে জাগতিক ও ঐশ্বী জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্র। আমি এখানে তাঁর কোন কোন কিতাবের কথা বলবো-দাওয়াতুল আমীর, মালায়কাতুল্লাহ, ইসলামে এখতেলাফাত কা আগায, হাস্তিবারিয়াতালা, সায়রেরূহানী, দিবাচা তফসীরুল কুরআন, ফাযায়েলে কুরআন,তফসীরে সগীর ও তফসীরে কবীর- সবই ছিল তাঁর জাগতিক জ্ঞান, কুরআনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মীয় জ্ঞান এবং খোদা প্রদত্ত ঐশী জ্ঞানের উজ্জ্বলতম বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর অসাধারণ জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও, ঢাকা

"সে বৃদ্ধি লাভ করবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসদ্ধি লাভ করবে"

"সে বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসদ্ধি লাভ করবে, জাতিগণ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে"। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯১৪ সনে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে খিলাফতে আসীন হয়েই বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করতে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওপর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো। এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি মুসলেহ মাওউদ (রা.) একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। আস্তে আস্তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি মোবাল্লেগ প্রেরণ করতে থাকেন। আজ আমরা সেই বীজগুলোকে বিশাল বৃক্ষরূপে দেখছি।

তিনি বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোতে মোবাল্লেগ প্রেরণ করেন যার ফলে সারা বিশ্বে আহমদীয়াতের প্রচারের দরজা খুলে যায়। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লন্ডন, ইন্দোনেশিয়া, মরিশাস, উগান্ডা, লাইবেরিয়া ইত্যাদি অনেক দেশে মোবাল্লেগের মাধ্যমে আহমদীয়াতের প্রচার করেন। ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছানো কোন সহজ কাজ ছিল না। তিনি ১৯৩৪ সনে জামা'তে সকল সদস্য-সদস্যাকে "তাহরীকে জাদীদ" নামে একটি নতুন পরিকল্পনার নির্দেশ দেন। যার মাধ্যমে বিদেশে মসজিদ নির্মাণ, মিশন প্রতিষ্ঠা, মুবাল্লেগ প্রেরণ ও ইসলাম প্রচারের বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা সহজতর হয়।

আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের দাওয়াত পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছানোর কাজ তিনি মহা সফলতার সাথে করেছেন। আর পৃথিবীর ইতিহাস আজ সাক্ষী তিনি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে ও ফযলে অত্যন্ত যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেছেন। মোটকথা দেশের ভিতর ও বাইরে চতুর্দিকে মুরুব্বী ও মোবাল্লেগ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর নির্দেশে যেতে থাকেন এবং তবলীগের কাজ চলতে থাকে।

নিশাত জাহান রজনী, আহমদনগর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

" ইসলামে ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ মার্চ, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। নিজ সংশোধন এবং একজন আদর্শ আহমদী।
২। আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**
*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**
*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

তিন দিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯০তম সালানা জলসা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিশ্ববাসীর শান্তি কামনার মাধ্যমে সফলতার সাথে সমাপ্ত

মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯০তম সালানা জলসা গত ৭, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকার বকশীবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। জলসার প্রথম দিনের কার্যক্রম শুরু হয় জুমুআর নামাযের পর। এতে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশশেরউর রহমান। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব বশীরুদ্দীন আহমদ।

এরপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। তিনি তার উদ্বোধনী ভাষণে জলসা সালানার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর লেখনীর আলোকে উপস্থাপন করেন। সেই সাথে তিনি বলেন, আমাদের বাংলাদেশ জামা'ত শত বছর অতিক্রম করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে দুর্বলতা এবং অক্ষমতা রয়ে গেছে তা আমাদেরকে দূর করতে হবে। আমাদের নিজেদের ভিতরের অবস্থান সংশোধন হলে তবেই আমাদের তবলীগে অগ্রগতি হবে। আমাদের সাথে যদি আল্লাহ্ তা'লার সম্পর্ক থাকে আর আমরা যদি আল্লাহ্ ওয়ালা হয়ে যাই তাহলে সবাই আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তিনি তার বক্তৃতার এক পর্যায়ে আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহ্' এই আয়াতে ঐক্যের যে কথা বলা হয়েছে তা আমাদের মাঝে বিদ্যমান খেলাফতের দিকেও ইঙ্গিত করছে। অতএব যুগ খলীফার সাথে দৃঢ়তর বন্ধন তৈরী করতে হবে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। এরপর তিনি দোয়া পরিচালনা করেন।

এরপর উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব কাশেম হোসাইন পিয়াস। বক্তৃতা পর্বে 'বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক রাব্বুল আলামীন' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। এ পর্যায়ে বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান। এরপর 'রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যা ৭ টায় এমটিএ-এর মাধ্যমে লন্ডনে প্রদত্ব হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি শ্রবণ করেন। খুতবা শেষে অ-আহমদী মেহমানদের নিয়ে বিশেষ প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়, যা রাত ১১টা পর্যন্ত চলে। এতে প্রায় কয়েক শতাধিক অ-আহমদী মেহমান উপস্থিত ছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সত্যতা উপলব্ধি করে বেশ কয়েকজন মেহমান হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন মোহতরম অধ্যাপক মোনেম বিল্লাহ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্রগ্রাম-এর সভাপতিত্বে সকাল ৯-৩০ মি. শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান। উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব জাকির হোসেন।

বক্তৃতা পর্বে 'পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মোহতর আহসান আহমদ খান চৌধুরী। 'নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা মামুন-উর-রশিদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব জি,এম, সিরাজুল ইসলাম।

এরপর আদর্শ আহমদী সমাজ গঠনে বিয়ে-শাদীর গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। এরপর 'ওসীয়্যত ব্যবস্থার গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। জলসার দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২:৪৫মি, থেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মসিউর রহমান। আরবী কাসিদা পাঠ করেন জনাব সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও তার দল।

বক্তৃতা পর্বে 'আহমদীয়াতের দৃষ্টিতে হযরত

মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ। এরপর 'হযরত ঈসা (আ.)এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন' এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ। এ পর্যায়ে বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব সিবগাতুর রহমান মুকুল। এরপর 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার কয়েকটি প্রমাণ' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বি সিলসিলাহ।

এরপর বেশ কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ওয়েষ্ট ইন্ডিজের গায়ানা বংশদ্ভূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসের চিনো জামা'তের জনাব জামিল মোহাম্মদ এবং হল্যান্ড জামা'তের সেক্রেটারী তরবিয়ত প্রবাসী বাঙ্গালী জনাব কাউসার আহমদ। অ-আহমদী বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জনাব মেসবাহ কামাল, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী জনাব ড. আব্দুল মঈন খান, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির সহ সভাপতি শ্রী কাজল দেবনাথ এবং প্রয়াত বিচারপতি কে এম সোবহানের পুত্র মানবাধিকার কর্মী জনাব কাজী রেহান সোবহান।

জলসার চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ৯ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯-৩০ মি.। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, জনাব হাফিজুর রহমান হারুন। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব নাসির আহমদ। বক্তৃতা পর্বে 'খেলাফতের প্রতি আনুগত্য' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আহমদ তৌসিফ চৌধুরী। এরপর 'হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর তাহরীক সমূহ' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ, বাংলাদেশ। এ পর্যায়ে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ শাহজাদা খান।

এরপর 'আধ্যাত্মিক জীবন লাভের প্রচেষ্টা ও এর সহজ পন্থা' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ। বিকাল ৩টায় বাংলাদেশের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩-৩০মি.। এতে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর, আলহাজ্জ মোবাশশেরউর রহমান। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌলবী হাফেজ আবুল খায়ের। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব মাহবুবুর রহমান। বক্তৃতা পর্বে 'আহমদীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা ও এর পরিণতি' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৫ ও সেক্রেটারী উমরে খারেজা, বাংলাদেশ। এরপর 'বিশ্ব শান্তি রক্ষায় যুগ-খলীফার আহ্বান' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ জলসার সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর, মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশেরউর রহমান। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দোয়ার মাধ্যমেই ৯০তম সালানা জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

জলসার সংবাদ বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ আকারে প্রকাশিত হয়। যেমন সমকাল, ইত্তেফাক, ডেইলি স্টার এবং নিউ এইজ। পুরো জলসার কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়, যার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আহমদীরাও জলসার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। [ডেস্ক রিপোর্ট]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের ৩৩-তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবশশেরউর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয় মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযল ও রহমতে আহমদীয় মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের সালানা জলসা ২০১৪ গত ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্র ও শনিবার (২দিন ব্যাপী) অত্যন্ত শান-শওকত ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয় আলহামদুলিল্লাহ।

জলসায় উদ্বোধনী, দ্বিতীয় ও সমাপনী অধিবেশেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সম্মানীত মেহমানগণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যথাক্রমে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবশশেরউর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয় মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, জনাব অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, ঢাকা জামা'ত ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ, আলহাজ্জ মওলনা সালেহ্ আহমদ, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, জনাব মওলানা বশিরুর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপাল-১, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, মওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল আমীন, ভাইস প্রিন্সিপাল-২, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, মওলানা জাফর আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্, আহমীদয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম, মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, স্থানীয় আমীর মোহতরম অধ্যক্ষ মোনেন বিল্লাহ ও স্থানীয় জামা'ত এর জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্জ নেছার আহমদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। আহমদী হওয়ার প্রেক্ষাপটের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ শাহেদ হোসেন।

তিন পর্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে, তেলাওয়াতে কুরআন পাঠ করেন জনাব হাফেজ মোস্তাক আহমদ, জনাব আনোয়ার আহমদ, জনাব হাফেজ নিজাম উদ্দিন। অত্যন্ত সুন্দর ও সুরেলা কণ্ঠে নযম পাঠ করেন জনাব আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান, জনাব সেলীম আহমদ, জনাব এহসান আহমদ, জনাব আব খায়ের ও জনাব আবদুল ওয়াহেদ। এছাড়া অ-আহমদী মেহমানদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি চট্টগ্রামের (দক্ষিণ) জেলার সভাপতি জনাব ফরিদ উদ্দিন খান, এডভোকেট ঋষিকেশ বাবুসহ-সভাপতি গনতান্ত্রিক পার্টি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা। এই মহতী ইমান বর্ধক সালানা জলসায় সর্বমোট ১১০৩জন যোগদান করেন যার মধ্যে স্থানীয় ও বিভিন্ন জেলা থেকে আগমনকারী আহমদী ও অ-আহমদী নারী পুরুষগণ ছিলেন। জলসায় ১১ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হোন।

উদ্বোধনী ভাষনে, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ, আগত অতিথি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জলসার সমস্ত কল্যান খোদা তা'লার তরফ থেকেই বর্ষিত হয়। বর্তমান বিশ্বে একমাত্র শান্তির ধর্ম ইসলামের সৌন্দর্য প্রকৃত পক্ষে আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমেই পালন করা সম্ভব। পরিশেষে জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর দোয়া পাঠ করে তিনি তা সকলকে অবগত করিয়ে দেন। শেষে তিনি দেশ ও বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন এবং জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। জলসার সংবাদ CTV-তে এবং স্থানীয় পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ৩৩তম সালনা জলসায় উদযাপনের সার্বিক মূল দায়িত্ব পালন করেন চেয়ারম্যান এস, এম, মঈন আল হোসাইনী ও সেক্রেটারী জনাব নুরুউদ্দিন মামুন। যারা যেভাবে জলসার সফলতার জন্য সময় দিয়েছেন আল্লাহ্ সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমীন।

খালিদ আহমদ সিরাজী
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ১লা ফেব্রুয়ারী ২০১৪ রোজ শনিবার বাদ মাগরীব আহমদীপাড়াস্থ মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন-আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর ধারাবাহিকভাবে জলসার আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম সম্পর্কে জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, খাতামান নবীঈন (সা.)-এর তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব আলমগীর কলিন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরমত সহিষ্ণুতা সম্পর্কে বক্তব্য রাকেন মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে মৌলবী আবু তাহের বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত হযরত রসূল করীম (সা.) এর অনুপম আদর্শ ও সীরাতের সার্বিক বিষয় উল্লেখ করে সমাপনী বক্তব্য রাখেন জলসার সম্মানিত সভাপতি। তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তৃতায় রাসূলুল্লাহ্‌র শিক্ষা ও মানবিক বিষয়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করে এথেকে আমাদের সকলের শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত করা হয়। জলসা শেষে ২ জন বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে পদার্পণ করেন। জলসায় ৬ জন মেহমানসহ মোট ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সেক্রেটারী তবলীগ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ঢাকার নাখালপাড়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ জানুয়ারী ২০১৪, আহমমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় স্থানীয় মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শামস উদ্দিন ভূইয়া। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইমদাদুল হোসেন। নযম পাঠ করেন জনাব সুলতান মাহমুদ আনওয়ার।

বক্তৃতা পর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কর্মময় জীবনের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার এবং মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। শেষে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৯জন জেরে তবলীগসহ মোট ৬০জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আলী হাসান

লাজনা ইমাইল্লাহ ভাতগাঁও-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ২৪ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভাতগাঁও-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন জামিয়া ইসমিতা।

এরপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সীরাত ও পবিত্র জীবন সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট, হাদিয়া রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট আইনুর আক্তার, জেনারেল সেক্রেটারী মেরুনা হোসেন, মেহেরুন্‌নেছা এবং সেক্রেটারী তালিম সম্পা আক্তার। সীরাতুন নবী জলসায় ১২ জন লাজনা ও ৪ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

হাদিয়া রহমান

নূরনগরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ২৪ জানুয়ারী ২০১৪, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ হতে শুরু করে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নূরনগর-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়।

স্থানীয়া জামা'তের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে সভার কাজ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা হয়। তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ তৌফিক জামান (মাহী), এরপর নযম পাঠ করেন মুহাম্মদ মাসরুর আহমদ (শাওম)। এরপর খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা করেন, যথাক্রমে সর্বজনাব মুহাম্মদ মুক্তার হোসেন, মুহাম্মদ রাজিব হাসান, মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান ও লাজনার প্রেসিডেন্ট মুছাম্মত রওশনয়ারা বেগম।

সবশেষে সভাপতির আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মেহমানসহ সর্বমোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

নারায়ণগঞ্জে নাসেরাত দিবস উদযাপন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ২৯-২০-২০১৪ রোজ বুধবার সকাল ১০ ঘটিকায় নাসেরাত দিবসের কর্মসূচী পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন রেহনুমা তারান্নুম উজালা। দিনব্যাপী প্রথম অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন ডা: শিমুল আহমদ। দোয়া ও আহাদনামা পাঠ করেন অনুষ্ঠানের সভানেত্রী। হাদিস ও অমৃতবাণী পাঠ করেন সানজিদা খন্দকার পৃতি ও নুসরাত জাহান বুশরা। বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করেন জান্নাতুল ফেরদৌস নদী, গাজালা কাউসার এবং খালুদ কাউসার। অত:পর মালী কুরবানী বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন তনিমা আহমদ লাবন্য ও তাহিয়াত তাহের বর্ষা। নাসেরাত দিবসের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মেহেদী উৎসব। মেহেদী পরিয়ে দেন আফরিন আহমদ হিয়া, তাসনুভা তাহের তৃণা ও খাওলাদীন উপমা। রান্না প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন মজার খাবার পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ। কুরআন তেলাওয়াত করেন নূরুননেসা মৃত্তিকা ও প্রতিভা পৃথি অহনা। এরপর এতায়াতে নেযাম এর ওপর বক্তব্য রাখেন আমাতুল হাই। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণ প্রদান করেন মোহতরমা দিলরুবা বেগম মায়া। পরিশেষে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভানেত্রীর ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরমা মাসুদা পারভেজ। নাসেরাত দিবসে ২৮ জন নাসেরাত, ৬ জন শিশু, ৩ জন আতফাল ৩৪ জন লাজনাসহ মোট ৭১ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

কৃতি ছাত্রী

* আমাদের ছোট কন্যা ***নুসরাত জাহান আসা*** ২০১৩ সালে জেএসসি পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ড থেকে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

পরীক্ষায় এ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তার মা ভাই ও বোনের অনুপ্রেরণাই বেশী ছিল। নুসরাত জাহান আসা জামা'তের সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

পিতা-বাহাউদ্দীন আহমদ
মাতা-রাশিদা বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বরিশাল

* আমার মেয়ে ***নুসরাত জাহান রাফা*** ২০১৩ সালের JSC পরীক্ষায় ঘোড়াশাল ইউরিয়া সারকারখানা স্কুল এন্ড কলেজ পলাশ ঘোড়াশাল থেকে Golden GPA-5 পেয়ে নবম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে একজন ওয়াকফে নও (নং-B-5533)। সে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চরসিন্দুর-এর নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যা।

এতদসঙ্গে তার জীবনের সকল পরীক্ষায় উজ্জ্বল কামিয়াবসহ সে যেন জামা'তের খেলাফতের একনিষ্ঠ খাদেমা হয় তজ্জন্য খাস দোয়া প্রার্থনা করছি।

মোহাম্মদ বোখারুল ইসলাম বোখারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরসিন্দুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের কর্মতৎপরতা

সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ২০-০১-২০১৪ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন- তামান্না হাছিন। হাদীস পাঠ করেন নাজিয়া সুলতানা। আহাদনামা পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। উক্ত অনুষ্ঠানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন নাসিমা বশির। এরপর নযম পেশ করেন কুররাতুল আঈন। নারী জাতির প্রতি রাসূল করীম (সা.)-এর উত্তম আচরণ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন মিলা পাটোয়ারী। হযরত রাসূল করীম (সা.) এর উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। জলসায় ৮৫ জন লাজনা, ৩৪ জন নাসেরাত ও একজন অ-আহমদী বোন উপস্থিত ছিলেন।

তালিম তরবিয়তী ক্লাস

গত ১১ ও ১২ই জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী নাসেরাতদের তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অত্যন্ত সুন্দরভাবে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথম দিন : কুরআন তেলাওয়াত করেন- তাবাস্‌সুম হোসাইন। আযানের কালাম ও অর্থসহ আযানের দোয়া সম্পর্কে বলেন- নাজিয়া সুলতানা। ওযুর নিয়ম, তৈয়মুম, অর্থসহ ওযুর দোয়া এবং ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার কারণসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন ফারজানা শাওন। নযম পরিবেশন করেন তাহিরা হোসাইন। এরপর সহীহ্ উচ্চারণে কুরআন শিক্ষা ক্লাস পরিচালনা করেন- নাসিমা বশির। দ্বিতীয় দিন : কুরআন তেলাওয়াত করেন ইয়াসমি আকন্দ। সামাজিক কদাচার সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন- রিজুয়ানা করিম। নযম পরিবেশন করেন আঁখি। নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন- নাসিমা বশির, কুররাতুর আঈন ও বিলকিস তাহের। সহীহ্ উচ্চারণে কুরআন শিক্ষা ক্লাস পরিচালনা করেন- নাসিমা বশির। উপস্থিত প্রথম দিন নাসেরাত ৪১ জন, লাজনা ১২ জন। ২য় দিন নাসেরাত ৪৬ জন, লাজনা ৮ জন।

নাসেরাত দিবস উদযাপন

গত ১৪-০১-২০১৪ রোজ সোমবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে দিনব্যাপী নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল ৯টায়। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন নাফিজা সুলতানা। হাদীস পাঠ করেন- সুমি আক্তার। নাসেরাতদের আহাদনামা পাঠ করেন- মরিয়ম। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন- প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। নযম পাঠ করেন স্নেহা রহমান। নাসেরাতদের গ্রুপ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত ও নযম প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং বিভিন্ন রকম খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। বিকেল ৩টায় ২য় অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন ইয়াসমিন আকন্দ। নসীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন- নাছিমা বশির, কুররাতুল আঈন এবং প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। এছাড়া নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আব্দুল মতিন। পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৪৬ জন নাসেরাত ও ৮ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

নাজিয়া সুলতানা

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

নাসেরাতুল আহমদীয়া, হল্যান্ডের উদ্যোগে সীরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে নাসেরাতুল আহমদীয়া, নেদারল্যান্ড গত ১২ই জানুয়ারি সীরাতুন নবী (সা.) জলসা'র আয়োজন করে। নূনস্পীট শহরের বাইতুন নূর কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই মহতি জলসাতে দেশের প্রায় সবগুলো মজলিস থেকে নাসেরাতগণ অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তারপর হাদীসে রাসূল (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক থেকে রাসূল (সা.)-এর শানে লিখা কিছু টেক্সট ও নযম পাঠ ও গেয়ে শুনানো হয়। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে নাসেরাতরা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তাদের বক্তৃতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। এরপর শুরু হয় রাসুল করীম (সা.)-এর পবিত্র-জীবনের ওপর ভিত্তি করে এক আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী কুইজ প্রোগ্রাম। তারপর ছিল খেলাধুলার একটি আয়োজন।

এরপর ন্যাশনাল সদর সাহেবা (লাজনা) স্বহস্তে নাসেরাতদেরকে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সবশেষে ছিল সান্ধ্যভোজের আয়োজন, এরপর ওয়াইন্ড আপের কাজেও নাসিরাতগণ শতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে, আলহামদুলিল্লাহ্।

যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে অনুষ্ঠিত তালীমুল ইসলাম কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বার্ষিক সভা ও নৈশভোজ

গত ২৫ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে তালীমুল ইসলাম কলেজ যুক্তরাজ্য শাখার প্রাক্তন ছাত্র সমিতি তাদের বার্ষিক সভা ও নৈশভোজের আয়োজন করে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে। আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর বরকতময় দিক-নির্দেশনায় ১৯৪৪ সালে এ কলেজ স্থাপিত হয় আর হুযূর (রা.) স্বহস্তে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এ কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রদের নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়।

প্রায় ১২০ জন ছাত্র এবং ৫৫ জন অতিথি এ সভায় যোগদান করেন। এ সময় প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের কলেজ জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেন।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর উপস্থিতির কারণে মূল অধিবেশনটি আরো আকর্ষণীয় ও বরকতময় হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, জনাব মুবারক সিদ্দিকী সাহেব রচিত ও উপস্থাপিত নযমের মাধ্যমে এ অধিবেশন আরম্ভ হয়।

এরপর এ সমিতির সভাপতি মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব গত বছরে এ সমিতির কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তুলে ধরেন এবং তিনি হুযূর (আই.)-কে স্বীয় উপস্থিতির মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানকে আশিসমন্ডিত করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সমাপ্তি ভাষণে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এ সমিতি গঠনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- নতুনরা যেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মহতি কর্মকান্ডে উজ্জীবিত হতে পারে।

হুযূর (আই.) এ সময় এই সমিতির বিভিন্ন প্রয়াসের প্রশংসা করেন, কিন্তু এ-ও স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'টিআই কলেজের' ব্যানারে আরো অনেক মহৎ উদ্যোগের অবকাশ রয়ে গেছে।

হুযূর (আই.) পরিচালিত সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে এ অধিবেশন সমাপ্ত হয় এবং তারপর আকর্ষণীয় নৈশভোজ সম্পাদন করা হয়। ঈশার নামাযের পর হুযুর (আই.) বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রুপ ছবি তোলেন এবং হুযূর (আই.)-এর মনোরঞ্জনের জন্য প্রাক্তন ছাত্ররা এ সময় বিভিন্ন পরিবেশনা ও খেলাধুলার আয়োজন করে, তন্মধ্যে বয়আত বাজী বা কবিতা পাঠের আসর, উর্দু কবিতা প্রতিযোগিতা এবং প্রাক্তন ছাত্র ও এমটি'এ দলের মধ্যে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য ।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ খেলায় এমটিএ দল মাত্র ২ পয়েন্ট এর ব্যবধানে জয়লাভ করে। হুযূর (আই.) অনুষ্ঠান-স্থল ত্যাগের পূর্বে দু'দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গেই করমর্দন করেন এবং এই আয়োজনের জন্য ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শেষ অধিবেশনে হুযূর (আই.)-এর দিকনির্দেশনায় ঘানার আমীর মওলানা আব্দুল্লাহ্ ওয়াহাব আদম সাহেবের সভাপতিত্বে পরবর্তী বছরের জন্য এ সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, অষ্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে মসরূর প্রীতি ক্রিকেট টূর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত

সিডনিতে আল্ মসরূর ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়া। গত ১১ ও ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অস্ট্রেলিয়া জামা'তের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সিডনির মসজিদ বাইতুল হুদাতে ভিক্টোরিয়া, কুইন্সল্যান্ড এবং সাউথ অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত খোদ্দাম ক্রিকেট-দলগুলো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। নিউ সাউথ ওয়েলসের দু'টি দলও এতে অংশ নিয়েছে।

প্রতিবছর ইউকে তে আন্তর্জাতিক আল্ মসরূর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়ায় দেশীয় পর্যায়ে এই প্রথম এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হলো। উদ্দেশ্য ছিল ইউকে-তে অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল বাঁছাই করা। এছাড়া, জামা'তের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

১০ জানুয়ারী শুক্রবার, টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খোদ্দামগণ সিডনির বাইতুল হুদা মসজিদে আসতে থাকেন। পরদিন শনিবার তাহাজ্জুত নামাজের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়ার সদর মোহতরম রানা ইজাজ আহমদ উপস্থিত খোদ্দামের উদ্দেশে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব, শৃঙ্খলা এবং সদাচরণের প্রদর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

এরপর, মোহতরম আমীর সাহেব, মওলানা মাহমুদ আহমদ শাহেদ একজন সত্যিকারের আহমদী মুসলমানের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহারের প্রতি তিনি জোর দেন।

সিডনি রেড এবং কুইন্সল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত ১৫ ওভারের ফাইনাল ম্যাচটি ছিল তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সিডনি রেড ১৮০ রান করে। জবাবে কুইন্সল্যান্ড ১২৪ রান করতে পারে। ফলে ৫৬ রানে সিডনি রেড জয়ী হয়।

এই টূর্নামেন্টের মাধ্যমে রয়্যাল ইনস্টিটিউট অভ ডেফ অ্যান্ড ব্লাইন্ড চিলড্রেনের জন্য অনুদান ও সংগ্রহ করা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র ফজলে এক হাজার ডলারের বেশি অনুদান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। পরিশেষে, সদর, খোদ্দামুল আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়া, বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

(১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদা তা'লার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.) এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ) হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(ইশতেহার, তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে: KENTO ASIA LTD — Garments & Buying House
KENTO STUDIOS — IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

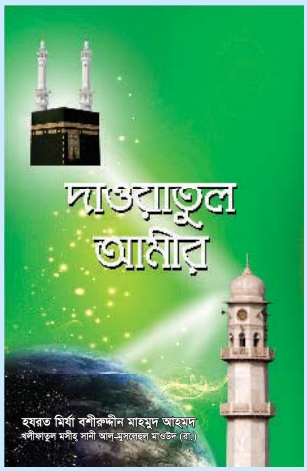

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

New Vol. No. 76 | 16th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

28th February, 2014 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com